ভোটারের মন

ও

আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত
“ভোটারের মন ও আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল” শীর্ষক
জাতীয় সেমিনার ও প্রেস কনফারেন্সে উপস্থাপিত গবেষণাপত্র

ঢাকা: ২৬ অক্টোবর ২০২৩

ভোটারের মন
ও
আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(e-mail: barkatabul71@gmail.com)

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত
"ভোটারের মন ও আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল" শীর্ষক
জাতীয় সেমিনার ও প্রেস কনফারেন্সে উপস্থাপিত গবেষণাপত্র

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
ঢাকা: ২৬ অক্টোবর, ২০২৩

ভোটারের মন
ও
আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

স্বত্ব ২০২৩ © আবুল বারকাত

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ও ফ্যাক্স: ৮৮০-২২২২২৫৯৯৬; মোবাইল: ০১৭১৬৪১৮৫০০
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com; ওয়েবসাইট: www.bea-bd.org

মূল্য: ৩০০ টাকা, ইউএস ১৫ ডলার, ইউরো ১২, ব্রিটিশ পাউন্ড ১০
(বিক্রয়লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হবে)

প্রচ্ছদ
আবু তালেব

মুদ্রণ
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা
ফোন: ০১৯৭১১১৮২৪৩
ই-মেইল: agami.printers@gmail.com

ISBN: 978-984-35-5105-4

উদ্ধৃতি সুপারিশ: আবুল বারকাত (২০২৩), ভোটারের মন ও আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা: ২৬ অক্টোবর, ২০২৩।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা: ২৬ অক্টোবর, ২০২৩।

সূচিপত্র

গবেষণা পদ্ধতি প্রসঙ্গে ৫

বেশি ভোট না-কি বেশি আসন? ৬

জিততে কত ভোট দরকার? ৯

ভোটারের ধরন শ্রেণিবিভাজন, ভিত্তি ভোট, ভিত্তি আসন (সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন), বিজয়-অনিশ্চিত আসন ১১

"দোদুল্যমান ভোটার" কী দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন? কী বলা হবে? কেমন হতে পারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত? ২২

কেমন হতে পারে আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য চূড়ান্ত ফলাফল? কোন দলের সরকার গঠন সম্ভাবনা কতটুকু? ৫০

উপসংহার ৫৪

ছক, বক্স, সারণি

ছক-১: গড় আসন প্রতি ভোটার ও জেতার ভোট (প্রারম্ভিক হিসেব) ১০

ছক ২: বিভিন্ন দলের সম্ভাব্য "ভিত্তি আসন" (যেসব দলের পক্ষে ওই আসনে ভিত্তি ভোট ৪০ শতাংশ বা তার অধিক, বিধায় আসন জেতা মোটামুটি নিশ্চিত; এসব আসনে জিততে দোদুল্যমান ভোটারদের যে ভোট দরকার, তা সম্ভাব্য বিজয়ী দল অপেক্ষাকৃত সহজে পেতে পারে) ১৮

ছক ৩: আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলভিত্তিক সম্ভাব্য আসন সংখ্যা (মোট আসনসংখ্যা ৩০০) ৫১

বক্স ১: ভোটের হিসেবপত্তরের কয়েকটি ধারণা (কনসেপ্ট) এবং সংশ্লিষ্ট যৌক্তিক মান ১৫

বক্স ২: প্রক্ষেপিত নির্বাচনী ফলাফলের সঠিকতা প্রসঙ্গে ৫৪

সারণি ১: ভোটারের ধরন শ্রেণি-বিভাজন, ভিত্তি ভোট, দোদুল্যমান ভোট, ভিত্তি আসন, পরিবর্তনীয় আসন ১৭

সারণি ২: বাংলাদেশে ভোটারদের বয়সকাঠামো ২৪

সারণি ৩: ২০২৪ নির্বাচনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বড় দল (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) যে সব বক্তব্য নিয়ে হাজির হবেন এবং তা "দোদুল্যমান ভোটারদের" (যাদের ভোটে জয়-পরাজয় নিশ্চিত হবে) ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে সম্ভাব্য কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে ৩০

সারণি ৪: ২০২৪ নির্বাচনে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে যেসব ফ্যাক্টর প্রভাব ফেলবে: ফ্যাক্টরভিত্তিক প্রভাবমাত্রা এবং প্রভাবের গতিমুখ ৪২

সারণি ৫: "বিজয়-অনিশ্চিত আসন" (ভিত্তি আসনবহির্ভূত আসন)-এর দলভিত্তিক সম্ভাব্য চূড়ান্ত আসন বণ্টন (মোট ১৪৫টি আসন) ৫০

সারণি ৬: আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলভিত্তিক সম্ভাব্য আসন বিন্যাস ৫২

ভোটারের মন ও আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল

এখন থেকে দুই মাস পরে ১২তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আসন্ন নির্বাচনে কোন দলের অবস্থা কেমন হতে পারে, তা জাতীয় কৌতূহলের বিষয়। আর সম্ভাব্য যা হতে পারে, তা কিসের ওপর নির্ভর করছে—এসব গভীর গবেষণার বিষয়। নির্বাচন ও ভোটবিষয়ক আন্তর্জাতিক গবেষণাসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ নিয়ে তত্ত্বের ঘাটতি নেই। কিন্তু এসব তত্ত্বকথার বেশির ভাগই আমাদের মতো দেশের জন্য স্বল্প প্রযোজ্য। যেমন, একজন ভোটার কীভাবে-কী দেখে তার ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন—এ নিয়ে যত তত্ত্বকথা আছে, তার বেশির ভাগই আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। আবার সংশ্লিষ্ট তত্ত্বকথার অনেকগুলো একত্র করলে প্রয়োজনীয় কিছু কথা বলা সম্ভব হলেও তা দিয়ে সংশ্লিষ্ট হিসেবপত্তর দাঁড় করানো যায় না। এসব সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই আমরা এই গবেষণাপত্রে আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল সম্ভাবনা এবং তার কার্যকরণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সম্ভাবনা-চিত্র বিনির্মাণে আমরা নির্মোহভাবে সর্বোচ্চ মাত্রার বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি। এ অনুশীলনে আমাদের প্রথম প্রধান অনুসিদ্ধান্ত হলো—আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক—যেখানে সব দল, প্রার্থী ও ভোটারের জন্য নির্বাচনী মাঠ হবে সমান সমতল। যেহেতু এ ধরনের একটি আদর্শ অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে কথা, সেহেতু আমাদের ভাবনায় ও হিসেবপত্তরে নির্বাচনী কারসাজি, প্রহসন, জোরজবরদস্তি, টাকাপয়সার খেলা—এসবের তেমন কোনো স্থান নেই।

গবেষণা পদ্ধতি প্রসঙ্গে

তত্ত্ব হিসেবে ভোটের পাটিগণিত বেশ সোজাসাপ্টা, তবে অঙ্কটা মেলানো কঠিন। যেকোনো দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে যা-কিছু বলা হয়, তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জাতীয়ভিত্তিক জরিপ (national survey)-নির্ভর। এসব জরিপ হতে পারে শুমারি বা সেন্সাস ধরনের (যেখানে সব আসন জরিপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়) অথবা প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা মাঠজরিপ ধরনের। কয়েকটি গুরুতর সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা কোনো নমুনা জরিপের আশ্রয় নিইনি। নমুনা জরিপ থেকে ভোটারের মনের গভীরের বিষয়াদি বোঝা দুঃসাধ্য ব্যাপার; এ ধরনের গুণগত বিষয়ের পরিমাণগত রূপান্তর সহজসাধ্য নয়; নমুনা জরিপ থেকে দোদুল্যমান ভোটার নির্ধারণ করাও সহজসাধ্য নয়; নমুনা জরিপ থেকে দলীয়

অনুগত ভোটার নিরূপণ করাও অত সহজ নয়; এ ধরনের জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা জরিপ খুবই ব্যয়বহুল। এসব কারণেই আমরা যা করেছি, তা হলো—পুরো বিষয়ের "যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ" (যাকে বলে inferential analysis)। এক্ষেত্রে সরাসরি শুমারি না করা হলেও বিগত কয়েকটি নির্বাচনের শতভাগ আসনের সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সব ধরনের তথ্যাদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আমরা এমন কিছু প্যাটার্ন নির্ণয় করতে চেয়েছি, যা আসন্ন নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট মাত্রায় প্রযোজ্য হতে পারে বলে আমরা মনে করি। এর পাশাপাশি দোদুল্যমান ভোটারদের মন বুঝতে আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের সাথে দীর্ঘ খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করেছি। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনসংশ্লিষ্ট অনুশীলনে আমরা কয়েকটি চলক (Variable) এবং তাদের সংশ্লিষ্ট মান-মাত্রা-গতিমুখ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। এসব চলকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো "ভিত্তি ভোট", "ভিত্তি আসন", "দোদুল্যমান ভোট", দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তের পেছনের ফ্যাক্টর-কাউন্টার ফ্যাক্টর (এসবই পরে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। আমরা মনে করি যে "যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি" (inferential analysis method এবং একই সাথে আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি) অবলম্বনে আসন্ন নির্বাচনে দলভিত্তিক সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তার সাথে নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ জরিপভিত্তিক ফলাফলের তেমন কোনো পার্থক্য থাকার কারণ নেই। কারণ, সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার পদ্ধতিগত ভিন্নতা মোটামুটি অভিন্ন ফলাফল দিতে পারে—যদি গবেষণা পদ্ধতির অন্তর্নিহিত যুক্তি ঠিকঠাক থাকে।

পদ্ধতিগতভাবে আরো একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর তা হলো—আমরা ধরে নিয়েছি যে, "আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক"। এর অর্থ হলো এই যে, আসন্ন নির্বাচন "অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক" না হলে আমাদের প্রক্ষেপিত দলভিত্তিক নির্বাচনী ফলাফল প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন "অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক" হবার সম্ভাবনা বিষয়ক প্রশ্নাদি আমাদের উত্থাপিত গবেষণাপত্রের জন্য প্রযোজ্য নয় বিধায় আমাদের পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

বেশি ভোট না-কি বেশি আসন?

আদর্শ অবস্থায় ভোট মানেই ভোটারের সম্মতি (consent)। এ সম্মতি গণতন্ত্রের লক্ষণ। আর গণতন্ত্র প্রয়োজন এ জন্যই যে তার আছে কিছু সহজাত মূল্য (intrinsic value)। নির্বাচনী গণতন্ত্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চসংখ্যক ভোটারের ওয়াকিবহালি-সম্মতি (informed consent) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একজন প্রার্থী কত ভোট পান তা গুরুত্বহীন নয়, তবে শেষ বিচারে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হলো—তিনি জিতছেন কি-না? দেশের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫১ আসনে জয়ী হলে একটি দল এককভাবে সরকার গঠনে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আর প্রাপ্ত আসনসংখ্যা তার কম হলে ১৫১ আসন পূরণসাপেক্ষে ওই দল জোটবদ্ধভাবে সরকার গঠন করতে পারে।

প্রতিদ্বন্দ্বী বড় দলগুলো ভোট করে সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সবার চেয়ে বেশি ভোট পেলেই যে সরকার গঠন নিশ্চিত—এ কথা ঠিক নাও হতে পারে। আবার তুলনামূলক একদম প্রান্তিক বা স্বল্প ভোটের ব্যবধানেও যে সরকার গঠন নিশ্চিত—এ কথাও ঠিক হতে পারে। অর্থাৎ ভোটের পাটিগণিত সোজাসাপ্টা সরলরৈখিক কোনো ব্যাপার নয়।

১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (এখন থেকে আওয়ামী লীগ) সবার চেয়ে বেশি ভোট (৩২ শতাংশ) পেয়েছিল; কিন্তু সরকার গঠন করতে পারেনি। ওই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-এর (এখন থেকে বিএনপি) তুলনায় আওয়ামী লীগ ১ শতাংশ বেশি ভোট পেয়েছিল। আর বিএনপি ১ শতাংশ কম ভোট (৩১ শতাংশ) পেয়েও সরকার গঠন করেছিল। ওই নির্বাচনে বিএনপি ৩১ শতাংশ ভোট নিয়ে আসন পেয়েছিল ১৪০টি (মোট আসনের ৪৭ শতাংশ), আর আওয়ামী লীগ ৩২ শতাংশ ভোট নিয়ে আসন পেয়েছিল ৯৩টি (মোট আসনের ৩১ শতাংশ)। ১৯৯১-এর নির্বাচনে বিএনপির তুলনায় আওয়ামী লীগ ভোট পেল ১ শতাংশ বেশি, আর আসন পেল প্রায় ৩৪ শতাংশ কম—এ পাটিগণিত মেলানো সহজসাধ্য নয়।

২০০১-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তুলনায় বিএনপি একটু বেশি বা প্রান্তিকভাবে একটু বেশি (৪০.৮৬ শতাংশ) ভোট পেয়েছিল। এই ভোট ছিল আওয়ামী লীগের (৪০.২১ শতাংশ) তুলনায় মাত্র ০.৭ শতাংশ বেশি। সরকার গঠন করল বিএনপি। কারণ, বিএনপি মাত্র ০.৭ শতাংশ বেশি ভোট পেয়ে তুলনামূলক অনেক বেশি আসনে জয়ী হয়েছিল—বিএনপির আসন ১৯৩ (মোট আসনের ৬৪ শতাংশ), আর আওয়ামী লীগের ৬২ (মোট আসনের ২১ শতাংশ)। ২০০১-এর নির্বাচনে বিএনপি ৪০.৮৬ শতাংশ ভোট পেয়ে আসন পেল ৬৪ শতাংশ, আর আওয়ামী লীগ ৪০.২১ শতাংশ ভোট পেয়ে আসন পেল ২১ শতাংশ—এখানেও ভোটপ্রাপ্তির হার-এর সাথে আসন জেতার হার-এর তেমন সম্পর্ক নেই।

আবার কোনো দল যদি তুলনামূলক অনেক বেশি ভোট পায়, তাহলে যে অনেক বেশি আসনও পাবে এবং সহজে সরকার গঠন করতে পারে—এ কথাও বেশ

সুনিশ্চিত। এমনটাই ঘটেছিল ২০০৮ সালের নির্বাচনে। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৪৮ শতাংশ ভোট পেয়ে মোট ৭৭ শতাংশ আসনে জিতেছিল (৩০০ আসনের মধ্যে ২৩০ আসনে), আর বিএনপি ৩১.৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে ১০ শতাংশ আসনে জিতেছিল (৩০০ আসনের মধ্যে ৩০ আসনে)।

২০০৮-এর নির্বাচন ছিল আওয়ামী লীগ-পক্ষীয় জোয়ারের নির্বাচন। ২০০৮-এর নির্বাচন "ভোটারের মন"-এর বিশেষ দিক বুঝতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। এ নির্বাচন নির্দেশ করে আওয়ামী লীগের জন্য জোয়ার আর বিএনপির জন্য ভাটা। এ নির্বাচনে প্রতি তিনজন ভোটারের একজন জোয়ারে গা ভাসাননি, তারা জোয়ারের বিপক্ষে ভাটার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আবার এ অবস্থা অতীতে বহু নির্বাচনেও দেখা গেছে—কখনও বিএনপির ক্ষেত্রে; আবার কখনও আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ বলে যে, আমাদের দেশের জাতীয় নির্বাচনে "এক-তৃতীয়াংশ ভোট সূত্র" বলে একটা কিছু কাজ করে। এটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে একটা "সার্বজনীন ভোট সূত্র" বলা চলে।

গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে "অপেক্ষাকৃত ভালো" নির্বাচন হিসেবে নিকট অতীতের চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই চারটি নির্বাচন হলো ১৯৯১, ১৯৯৬ জুন, ২০০১ ও ২০০৮। এসব নির্বাচনে এখনকার বড় দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়েই স্বতঃস্ফূর্ত-সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল এবং প্রতিটি নির্বাচনে উভয়েই কমপক্ষে ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এই চারটি নির্বাচনের পরে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়েই দুবার করে সরকার গঠন করেছিল। নিকট অতীতের এই চারটি তুলনামূলক ভালো ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দুটো উপসংহারে আসা যেতে পারে, যা আগামী নির্বাচন ভাবনায় কার্যকর উপাদান হতে পারে। **প্রথমত,** সরকার গঠন যদি উদ্দেশ্য হয়, সেক্ষেত্রে দেশের মোট কত শতাংশ ভোটারের ভোট আপনি পাচ্ছেন—তা একই সাথে গুরত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন হতে পারে। তবে শেষ বিচারে গুরুত্বপূর্ণ হলো ৩০০ আসনের কতটিতে আপনি জয়ী হয়েছেন। **দ্বিতীয়ত,** প্রতিদ্বন্দ্বী বড় দলের প্রার্থী হিসেবে—জোয়ার হোক আর ভাটা হোক—আপনি মোট ভোটের (আনুমানিক) কমপক্ষে ৩০ শতাংশ ভোট পাবেন। তবে ৩০ শতাংশ ভোট দিয়ে মোট কত আসন পাবেন তা বলা সম্ভব নয়। এই ৩০ শতাংশ ভোটারের দলীয় আনুগত্য প্রশ্নাতীত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "ভোটারের মন" নিরূপণে এদের "মনস্থির ভোটার" (fixed mind voter) বলা যায়। এসব ভোটারের ভোট ছাড়া যেমন একটি আসনে জেতা সম্ভব নয়, আবার শুধু এসব ভোটারের ভোট দিয়েও আসন জেতা সম্ভব নয়।

জিততে কত ভোট দরকার?

দেশে মোট ভোটারের সংখ্যা এখন প্রায় ১২ কোটি (নির্বাচন কমিশন সূত্রমতে ১১ কোটি ৯০ লক্ষ)। মোট সংসদীয় আসন সংখ্যা ৩০০। এ হিসেবে আসনপ্রতি গড় ভোটারসংখ্যা ৪ লক্ষ (তবে আসনভেদে কম-বেশি হবে)। একটি আসনে জিততে হলে কত ভোট পেতে হবে, এ হিসাব তুলনামূলক সোজা হতে পারে। তবে ভোট যারা দেবেন, তারা কী দেখে ভোট দেবেন (অর্থাৎ সম্মতি প্রদান করবেন)—এ প্রশ্নের উত্তর আদৌ সোজাসাপ্টা নয়। এ উত্তরের ওপর ভিত্তি করেই বলা সম্ভব—নির্বাচনে সম্ভাব্য চূড়ান্ত ফলাফল কেমন হতে পারে। তবে নিতান্ত অনুমান অথবা ভালো লাগা না-লাগার ভিত্তিতে এসব হিসেবপত্তর বিজ্ঞানসম্মত নয়। এ ক্ষেত্রে ভোট গবেষকেরা প্রয়োজনীয় যে কাজটি করে থাকেন, তা হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের এক বা একাধিক যুক্তিসিদ্ধ প্যাটার্ন বা ধাঁচ নিরূপণ করে এগোনো। আমরা সেটাই করেছি।

"ভোটারের মন" ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির প্যাটার্ন বা ধাঁচ বোঝার ক্ষেত্রে (প্রারম্ভ বিন্দু হিসেবে) নিকট অতীতের উল্লিখিত চারটি নির্বাচনকে (১৯৯১, ১৯৯৬ জুন, ২০০১, ২০০৮) "অপেক্ষাকৃত ভালো" পরিমাপক হিসেবে দেখা যেতে পারে। এসব নির্বাচনে এখনকার দুই বড় দল—আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়েই অংশগ্রহণ করেছিল এবং প্রতিটি নির্বাচনে উভয়েই কমপক্ষে ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এই চারটি নির্বাচনের সার্বিক ও আসনভিত্তিক ফলাফল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আমরা এমন একটি সাধারণ প্যাটার্ন নিরূপণ করেছি, যা আগামী নির্বাচনের হিসেবপত্তরে কিছুটা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এসব হিসেব যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ ও গতিময়। সাধারণ প্যাটার্নটি এ রকম: (১) (নির্বাচনে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সবসময় বড় দলের প্রার্থীর মধ্যে (এর অর্থ আগামী নির্বাচনে এটা হবে আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপি); (২) শতকরা ৯৫ ভাগ আসনে (৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৫ আসনে) চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় দুজন প্রার্থীর মধ্যে—যখন ৪৬ শতাংশ ভোট পেলে জয় নিশ্চিত হয়; এসব আসনে ১০ শতাংশ ভোট পান তৃতীয় স্থান থেকে সর্বনিম্ন অবস্থানের প্রার্থীরা; (৩) শতকরা ৫ ভাগ আসনে (৩০০ আসনের মধ্যে ১৫ আসনে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুজনের মধ্যে হলেও তৃতীয় স্থান থেকে সর্বনিম্ন অবস্থানের প্রার্থীরা ১৫ শতাংশ ভোট পান, এক্ষেত্রে এসব আসনে ৪৩ শতাংশ ভোট পেলে জয় নিশ্চিত হয়।

উপরোল্লিখিত চারটি নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণে আরো যেসব সাধারণ প্যাটার্ন (বা ধাঁচ) পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে আগামী নির্বাচনের জন্য বেশ নিশ্চিতভাবেই

আরো কয়েকটি বিষয় বলা সম্ভব: (১) একটি আসনে জেতা/জয় নিশ্চিত করতে হলে ওই আসনে বিজয়ী প্রার্থীকে মোট ভোটারের (অথবা একই কথা প্রদেয় ভোটের অথবা বৈধ ভোটের) ৪৬ শতাংশ ভোট পেতে হবে; (২) একটি দল যত আসনে ৪৬ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পাবে, ওই দলের মোট বিজয়ী আসনসংখ্যাও ঠিক ততটিই হবে (এর কম নয়); (৩) একটি দল যদি অনেক বড় আসনে (যেখানে ভোটার সংখ্যা ৬-৭ লক্ষ) অনেক ভোট পায়, অর্থাৎ ৬০-৬৫ শতাংশ ভোট পায় আর অপেক্ষাকৃত ছোট আসনে (যেখানে ভোটার সংখ্যা ২-২.৫ লক্ষ) কম ভোট পায়, অর্থাৎ ৩৩-৩৫ শতাংশ ভোট পায়—সেক্ষেত্রে মোট ভোটের অপেক্ষাকৃত বেশি ভোট পেয়েও সে অপেক্ষাকৃত কম আসনে বিজয়ী হতে পারে। একইভাবে উল্টোটাও হতে পারে—যদি কোনো দল সব বড় আসনে হারে এমনকি ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়ে (যেখানে আসনপ্রতি ৬-৭ লক্ষ ভোট), আর বেশির ভাগ ছোট আসনে খুব কম ব্যবধানেও জেতে (যেখানে আসনপ্রতি ২-২.৫ লক্ষ ভোট); সেক্ষেত্রে ওই দল তুলনামূলক কম ভোট পেয়েও তুলনামূলক অনেক বেশি আসনে জয়ী হতে পারে। অতীতে এসব অনেক ঘটেছে। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই (অন্তত ১৯৯১, ১৯৯৬-জুন, ২০০১, ২০০৮ নির্বাচন) তা বিশেষ পূর্বপরিকল্পিত ছিল না বলেই মনে হয় (অর্থাৎ এসব সচেতন নির্বাচন পরিকল্পনার অংশ নাও হতে পারে)।

তাহলে প্রারম্ভিক হিসেবপত্তর যা দাঁড়াচ্ছে, তা হলো এ রকম: আদর্শ অবস্থায় একটি আসনে (গড়ে) ভোটারসংখ্যা ৪ লক্ষ, জিততে লাগবে ৪৬ শতাংশ ভোট অর্থাৎ ৪ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ভোট। অর্থাৎ ভোটারসংখ্যা কমবেশি যেটাই হোক না কেন—জিততে হলে ৪৬ শতাংশ ভোটদাতার সম্মতি পেতে হবে (ছক-১।

ছক-১: গড় আসন প্রতি ভোটার ও জেতার ভোট (প্রারম্ভিক হিসেব)

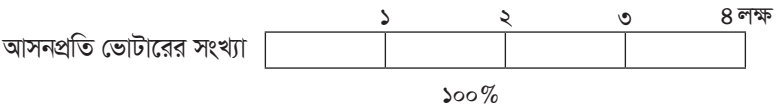

এখন প্রশ্ন—কে বা কোন প্রার্থী 'পাবে অথবা পেতে পারে' প্রতি আসনে ৪৬ শতাংশ ভোট? এ প্রশ্নের সহজ কোনো উত্তর নেই। এসব নিয়ে আমরা যা পারি তা হলো, আরো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় কোনো নির্দেশনা পেতে। এখানেই আসে ভোটারের ধরন শ্রেণিবিভাজন এবং ধরন অনুযায়ী ভোটারের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত গ্রহণে আচরণগত বিষয়াদি।

ভোটারের ধরন শ্রেণিবিভাজন, ভিত্তি ভোট, ভিত্তি আসন (সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন), বিজয়-অনিশ্চিত আসন

আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদান ক্ষমতার অধিকারী প্রায় ১২ কোটি মানুষ (ভোটার)। নির্দিষ্ট ভোটার কোন দলের প্রার্থীকে ভোট দেবেন তা অজানা। আসলে তা ভোটের পরেও জানা সম্ভব নয়, কারণ ভোট গোপন ব্যালটের বিষয়। আর এটা যদি অজানাই থেকে যায়, তাহলে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে এ মুহূর্তে ভোটের আগে কোনো উপসংহারে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা সুস্পষ্টভাবেই জানি যে প্রত্যেক ভোটার মাত্র একটি করে ভোট দেবেন এবং সেটা দেবেন সুনির্দিষ্ট কোনো দলের প্রার্থীকে ('না' ভোট এবং 'বাতিল' ভোট-এর প্রসঙ্গ বাদ দিচ্ছি)। এখানে যৌক্তিক প্রশ্ন হলো—একজন ভোটার কোন দলের প্রার্থীকে ভোট দেবেন তা-কি ভোটের অনেক আগেই ঠিক করে ফেলেন (বা মনস্থির করে ফেলেন) না-কি তা নিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করার সময় পর্যন্ত ভাবেন? এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্ভাব্য সহজ উত্তর পেতে হলে ধরন অনুযায়ী ভোটারের শ্রেণিবিভাজন করাটাই যুক্তিযুক্ত। আমাদের মতে, ভোটার হতে পারে দুই ধরনের। **প্রথম ধরনের ভোটার** (ধরন-১ ভোটার) হলেন তারা, যারা কোন দলের প্রার্থীকে ভোট দেবেন—তা ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছেন—এরা হলেন **"মনস্থির ভোটার"**। এসব ভোটার হলেন দলীয় অনুগত ভোটার—দলীয় সদস্য থেকে শুরু করে দলের প্রতি সহানুভূতিশীল-সহমর্মী ভোটার। এসব ভোট হলো "অপরিবর্তনীয় ভোট", যা যেকোনো অবস্থাতেই একদল থেকে অন্যদলে 'সুইচ' বা স্থানান্তরিত হবে না। নির্দিষ্ট দলের পক্ষে এসব ভোট হলো ওই দলের জন্য **"ভিত্তি ভোট" বা "**বেইজ ভোট' বা "ফ্লোর ভোট"। একটি দলের "ভিত্তি ভোট" হলো ওই দলের "সর্বনিম্ন ভোট"। সুনির্দিষ্ট দলভিত্তিক এসব ভোট সম্পর্কে আমরা বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদ্‌ঘাটন করেছি (এ বিষয়ে একটু পরে আসছি)। **দ্বিতীয় ধরনের ভোটার** (ধরন-২ ভোটার) হলেন সেইসব ভোটার, যারা কোনো অর্থেই দলীয় অনুগত নন, যারা কোন দলের প্রার্থীকে ভোট দেবেন—সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত সুনিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত নেননি বা এ বিষয়ে এখনও মনস্থির

করেননি। এসব ভোটার ভোট প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছানো পর্যন্ত সময় নিতে পারেন। প্রথম ধরনের ভোটারদের ভোট অপরিবর্তনীয় হলে দ্বিতীয় ধরনের ভোটারদের ভোট পরিবর্তনীয় (অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে সুইচ হতে পারে)। এসব ভোটারকে আমরা **"দোদুল্যমান ভোটার"** বলে আখ্যায়িত করছি। এসব ভোটার কোন দলের প্রার্থীকে ভোট দেবেন, তা সরাসরি জানা নেই। তবে তা জানতে আমরা যা করতে পারি, তা হলো—এসব ভোটারের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে কোন কোন ফ্যাক্টর (বিষয়াদি) আসলেই কাজ করতে পারে অথবা প্রভাব ফেলতে পারে, তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা এবং তা থেকে এসব ভোটারের দলগত ভোট প্রদানের সম্ভাবনা প্যাটার্ন বা চিত্র বিনির্মাণ করা। এটাই আমরা চেষ্টা করছি।

অতীতে যেসব নির্বাচন "অপেক্ষাকৃত ভালো" হয়েছিল, তেমন প্রশ্ন ওঠেনি এবং যেসব নির্বাচনে সব বড় দল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল তারই ভিত্তিতে "ভোটের আগে ভোটারের মন" (অথবা ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত অথবা সম্মতি) সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক কিছু সাধারণ প্যাটার্নের কথা বলা যায়, যা যথেষ্ট দিকনির্দেশমূলক। দিকনির্দেশনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্নটি এ রকম: ১০ শতাংশ ভোটার দলীয় অনুগত ভোটার (ধরন-১ ভোটার) হিসেবে ভোট দেন দুই মূল প্রতিদ্বন্দ্বীর (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) বাইরে অন্যান্য দলে (এসব ভোটার হলেন তৃতীয় থেকে শেষ স্থান অধিকারী প্রার্থীদের দলীয় অনুগত ভোটার), আর বাদবাকি ৯০ শতাংশ ভোটার সমান তিন ভাগে বিভক্ত—৩০ শতাংশ ভোটার আওয়ামী লীগের দলীয় অনুগত ভোটার (ধরন-১ ভোটার), ৩০ শতাংশ ভোটার বিএনপির দলীয় অনুগত ভোটার (ধরন-১ ভোটার), আর বাকি ৩০ শতাংশ ভোটার "মনস্থির না করা ভোটার" বা "দোদুল্যমান ভোটার" (ধরন-২ ভোটার)। অর্থাৎ ৭০ শতাংশ ভোটার হলেন "মনস্থির ভোটার" (ধরন-১ ভোটার) আর ৩০ শতাংশ ভোটার "দোদুল্যমান ভোটার" (ধরন-২ ভোটার)। ভোটগণিত বলে যে শেষের এই ৩০ শতাংশ ভোট—"দোদুল্যমান ভোটার"-এর ভোট দিয়েই কোনো আসনে চূড়ান্ত বিজয় নির্ধারিত হয়। ভোটগণিতের এই সমীকরণ যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত এ জন্য যে সংশ্লিষ্ট সমীকরণে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তনীয় এবং অপরিবর্তনীয় সূচকের মান দুই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) জন্য সমান, একমাত্র পরিবর্তনীয় সূচক হলো "দোদুল্যমান ভোট।"

"ভোটের আগে ভোটারের ভোট প্রদান-সিদ্ধান্ত প্যাটার্ন"—এ বিষয়ে "দলীয় অনুগত ভোটার"দের (ধরন-১ ভোটার) জন্য সংখ্যাতাত্ত্বিক যা-কিছু উল্লেখ করলাম (সারণি ১) তার পেছনের যুক্তিটা স্পষ্ট করা দরকার। যুক্তিটা জটিল নয়। আর তা হলো, আগেই বলেছি যে অনেক ভোটার আছেন যাদের দলগত

আনুগত্য প্রশ্নাতীত—সবকিছু উল্টে গেলেও তারা তাদের অনুগত দলেই ভোট দেবেন (এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থী অপছন্দ হলেও)। প্রশ্ন হতে পারে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়ের পক্ষে দলীয় অনুগত ভোট অথবা "ভিত্তি ভোট" (ধরন-১ ভোটারের ভোট) ৩০ শতাংশ ভোট কেন? কেন তা ২৫ শতাংশ বা ৩৫ শতাংশ না। এ প্রশ্নে আমাদের যুক্তি হলো এ রকম: বড় দুই দল—আওয়ামী লীগ ও বিএনপি—নিকট অতীতের চারটি "অপেক্ষাকৃত ভালো" নির্বাচনের যেকোনোটিতে যখনই পরাজিত হয়েছে (অর্থাৎ সরকার গঠনে সক্ষম হয়নি) তখনও তারা (অর্থাৎ পরাজিত দল) **মোটামুটি ৩০ শতাংশ** ভোট পেয়েছে অর্থাৎ ৩০ শতাংশ অনুপাতটা তাদের জন্য মোটামুটি স্থির। এরা হলেন দুদলের প্রত্যেকের "হার্ডকোর ভোটার" বা "ইতিমধ্যে মনস্থির ভোটার"—এসব ভোটারের ভোট (৩০ শতাংশ ভোট) হলো প্রত্যেক দলের জন্য "ভিত্তি ভোট" বা "বেইজ ভোট" বা "ফ্লোর ভোট"—যেকোনো অবস্থাতেই তারা এ ভোট পাবেন (এর কম পাবেন না)। অর্থাৎ ৩০ শতাংশ ভোট হলো যেকোনো অবস্থাতেই পরাজিত বড় দলের সর্বনিম্ন ভিত্তি শক্তি।

আওয়ামী লীগ অথবা বিএনপি—কোনো দলের প্রার্থীই **শুধু** ভিত্তি ভোট (অথবা বেইজ ভোট) দিয়ে কোনো আসনেই জিততে পারবেন না। কারণ, যেকোনো আসনে জিততে হলে প্রার্থীকে পেতে হবে ৪৬ শতাংশ ভোট। এর অর্থ হলো, জিততে হলে ভিত্তি ভোটের (৩০ শতাংশ) সাথে আরো ১৬ শতাংশ ভোট যোগ করতে হবে, যা আসবে দোদুল্যমান ৩০ শতাংশ ভোট থেকে (জিততে হলে যার ৫৬ শতাংশ পেতে হবে)।

এতক্ষণ যা বললাম তা হলো প্রধানত "ভিত্তি ভোট "(ধরন-১ ভোট) ও "দোদুল্যমান" ভোট (ধরন-২ ভোট) কেন্দ্রিক। প্রশ্ন হলো **"ভিত্তি ভোট"** (যা যেকোনো দলের জন্য "নিশ্চিত ভোট" বা নিশ্চিত সর্বনিম্ন ভোট) বলে কিছু থাকলে **"ভিত্তি আসন"** (বা বেইজ আসন) অথবা একই কথা "সম্ভাব্য বিজয়-সুনিশ্চিত আসন" বলে কিছু আছে কি? আমাদের উত্তর হলো "ভিত্তি আসন" বা "সম্ভাব্য বিজয়-সুনিশ্চিত আসন" বলে অবশ্যই কিছু আসন আছে—যা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি—উভয়েরই আছে (আর ১৫টি আসনের কয়েকটিতে তা জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামীসহ আরো দু-একটি দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (সারণি-১)।

"ভিত্তি আসন" বা "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন" বিষয়টি এ রকম : আওয়ামী লীগ ও বিএনপির জন্য "ভিত্তি ভোট" হিসেবে যে ৩০ শতাংশ ভোটের কথা বলা হলো, তা একান্তই গড় ভোট। তা সারা দেশের ৩০০ আসনে তাদের প্রার্থীদের

গড়-ভিত্তি ভোট, যা বাস্তবে বিভিন্ন আসনে ২৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। প্রশ্ন হলো, আওয়ামী লীগ অথবা বিএনপি—যেকোনো দলের প্রার্থী যদি কোনো আসনে "ভিত্তি ভোট" হিসেবে ৩০ শতাংশ নয় ৪০ শতাংশ ভোট পান, তাহলে কী হবে? তাহলে ৪০ শতাংশ "ভিত্তি ভোট" দিয়েই ওই আসন বিজয় নিশ্চিত হতে পারে—এটাই হলো সেই অবস্থা, যে অবস্থায় ৪০ শতাংশ ভিত্তি ভোটই হবে "ভিত্তি আসন" অথবা "সম্ভাব্য বিজয়-সুনিশ্চিত আসন"। এটা হবে এ জন্যই যে, যে প্রার্থী ৪০ শতাংশ ভিত্তি ভোট নিশ্চিত করতে পারেন, তিনি দোদুল্যমান ৩০ শতাংশ ভোট থেকে ৬ শতাংশ ভোট (অথবা একই কথা ৩০ শতাংশ দোদুল্যমান ভোটের মধ্যে ২০ শতাংশ ভোট) সহজেই পাবেন (জিততে দরকার ৪৬ শতাংশ ভোট)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ দোদুল্যমান ভোট বিষয়টি শতভাগ আসনের ক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকর থাকে না। একইভাবে যদি কোনো আসনে কোনো প্রার্থীর ৪৬ শতাংশ ভোটই ভিত্তি ভোট হয় সেক্ষেত্রে 'ভিত্তি ভোট' আর 'ভিত্তি আসন' পুরোপুরি সমার্থক—যেখানে দোদুল্যমান ভোট (ধরন-২ ভোটার)-এর কোনো কার্যকারিতা থাকে না (গোপালগঞ্জ, ফেনী, নোয়াখালী, রংপুরে এ ধরনের আসন আছে)।

দেশের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও অন্যান্য দলের এমন আসনসংখ্যা কতটি—যেখানে তাদের ভিত্তি ভোট (বেইজ ভোট) ৪০ শতাংশ বা তার বেশি? এসব আসনই হলো উভয়ের জন্য "ভিত্তি আসন" অথবা "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন"। আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী, দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে যেসব আসনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও অন্যান্য দলের যেকোনো প্রার্থী ভিত্তি ভোট হিসেবে ৪০ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পাবেন—সেসব আসনে সংশ্লিষ্ট দলের প্রার্থীর বিজয় মোটামুটি সুনিশ্চিত (এসব বলা চলে "অপরিবর্তনীয় আসন")। এসব "সম্ভাব্য বিজয়-সুনিশ্চিত" আসনের সংজ্ঞাসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা বক্স-১এ বলা হয়েছে।

বক্স ১: ভোটের হিসেবপত্তরের কয়েকটি ধারণা (কনসেপ্ট) এবং সংশ্লিষ্ট যৌক্তিক মান

১। মোট ভোট (ভোটার) = ১০০ শতাংশ (২০২৪ নির্বাচনে প্রায় ১২ কোটি ভোটার);

২। "ভিত্তি ভোট" (দলীয় অনুগত/মনস্থির ভোট/যেকোনো দলের সর্বনিম্ন ভোট/বেইজ ভোট/ধরন-১ ভোট) = আওয়ামী লীগ ৩০ শতাংশ, বিএনপি ৩০ শতাংশ, অন্যান্য দল ১০ শতাংশ;

৩। "দোদুল্যমান ভোট" (দলীয় অনুগত নয়/মনস্থির ভোট নয়/এখনও ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত নেননি/ধরন-২ ভোট) = ৩০ শতাংশ ভোট;

৪। "ভিত্তি আসন" ("সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন"): যেসব আসনে প্রার্থীর ভিত্তি ভোট ৪০ শতাংশ বা তার বেশি। দেশের ৩০০টি আসনের মধ্যে যেকোনো আসনকে কোনো দলের "ভিত্তি আসন" (যেখানে "ভিত্তি ভোট" ৪০ শতাংশ বা তার বেশি) হিসেবে যোগ্য হতে হলে নিচের যেকোনো এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করতে হবে (এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে নিকট অতীতের চারটি "অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য" নির্বাচনের ফলাফল—১৯৯১, ১৯৯৬ জুন, ২০০১, ২০০৮): (১) প্রার্থীর দল চারটি নির্বাচনের সবকটিতে ওই আসনে জয়ী হয়েছে, (২) প্রার্থীর দল ওই আসনে তিনটি নির্বাচনে জিতেছে এবং গড়ে ৪২ শতাংশ ভোট পেয়েছে, (৩) প্রার্থীর দল ওই আসনে দুটি নির্বাচনে জিতেছে এবং গড়ে ৪৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে (দুটি দলের অবস্থা একই রকম হলে আসনটি "ভিত্তি আসন" হবে না), (৪) প্রার্থীর দল সরকার গঠন করতে পারেনি কিন্তু প্রার্থী ওই আসনে কমপক্ষে ৪২ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছেন, (৫) প্রার্থীর দল সরকার গঠন করতে পারেনি কিন্তু প্রার্থী ওই আসনে হারলেও ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। "ভিত্তি আসন" হিসাবের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় বিবেচনায় রাখা হয়েছে—নির্বাচনী ঐক্য করা হয় (রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরে) বেশি ভোট পাবার জন্য, সেক্ষেত্রে ২ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ অতিরিক্ত ভোট হতে পারে "নির্বাচনী ঐক্যের কারণে ভোট";

৫। "বিজয়-অনিশ্চিত আসন" : যেসব আসনে কোনো দলের ভিত্তি ভোট ৪০ শতাংশ-এর কম (বড় দুই দলের ক্ষেত্রে গড় ৩০ শতাংশ)। বিজয়-অনিশ্চিত আসন = দেশের সব আসন বিয়োগ "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন";

৬। জেতার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট = ৪৬ শতাংশ; ভিত্তি ভোট ৩০ শতাংশ হলে দোদুল্যমান ৩০ শতাংশ থেকে অতিরিক্ত ১৬ শতাংশ সংগ্রহ করতে হবে; ভিত্তি আসনে অর্থাৎ যেখানে ৪০ শতাংশ বা তার বেশি ভিত্তি ভোট, সেখানে দোদুল্যমান ৩০ শতাংশ থেকে সর্বনিম্ন ৬ শতাংশ সংগ্রহ করতে হবে।

আমাদের হিসাবে দেশে ভিত্তি আসনের আনুমানিক সংখ্যা হবে মোট ১৫৫টি (দেশে মোট আসনের ৫১.৭ শতাংশ)। এই ১৫৫টি 'সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন' অথবা "ভিত্তি আসন"-এর বণ্টন হবে এ রকম: আওয়ামী লীগ ৭০টি আসন (মোট আসনের ২৩ শতাংশ), বিএনপি ৭০টি আসন (মোট আসনের ২৩ শতাংশ), আর অন্যান্য দল ১৫টি আসন (মোট আসনের ৫ শতাংশ) (ছক-২এ বিভিন্ন দলের আসনভিত্তিক "ভিত্তি আসন"-এর বণ্টন অবস্থা দেখানো হলো)। এসব আসনে "দোদুল্যমান ভোট" বা "পরিবর্তনীয় ভোট"-এর খুব একটা ভূমিকা থাকবে না। তবে এর বিপরীতে আমাদের হিসেবপত্তর বলছে যে ৩০০টি আসনের বাদবাকি ১৪৫টি আসনে (মোট আসনের ৪৮.৩ শতাংশ) জয়-পরাজয় নির্ধারণে দোদুল্যমান ৩০ শতাংশ ভোটের ভূমিকা হবে নিয়ামক-নির্ধারক।

আমরা কেন বলছি যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি—প্রত্যেকের ভিত্তি আসনসংখ্যা ৭০টি? আমরা যে পদ্ধতি মেনে হিসেবপত্তর করেছি তা হলো এই দুই দলের যেকোনো একটি দল যখন সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়নি, তখন ওই দল যেসব আসনে জিতেছিল এবং কমপক্ষে ৪২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল আর একই সাথে যেসব আসনে পরাজিত হয়েছিল এবং কমপক্ষে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল এই দুই ধরনের আসনের যোগফলই হলো সেইসব আসন, যার মধ্যে আছে ওই দলের মোট 'প্রাথমিক' ভিত্তি আসন। ১৯৯৬ ও ২০০৮-এর নির্বাচনের পরে সরকার গঠন করেছিল আওয়ামী লীগ, আর ১৯৯১ ও ২০০১-এর নির্বাচনের পরে সরকার গঠন করেছিল বিএনপি। ১৯৯৬ ও ২০০৮-এর নির্বাচনে পরাজিত দল-বিএনপির গড় অবস্থা ছিল এ রকম: ৫৫টি আসনে কমপক্ষে ৪২ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছিল, আর ৪৭টি আসনে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে হেরেছিল—এই দুয়ের যোগফল ১০২টি আসন। আর ১৯৯১ ও ২০০১-এর নির্বাচনে পরাজিত দল আওয়ামী লীগের গড় অবস্থা ছিল এ রকম: ৫২টি আসনে কমপক্ষে ৪২ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছিল, আর ৫০টি আসনে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে হেরেছিল—এ দুয়ের যোগফলও ১০২টি আসন। অর্থাৎ কাকতালীয়ভাবে উভয়েরই সমান সমান মোট গড় 'প্রাথমিক' ভিত্তি আসনসংখ্যা ১০২টি। কিন্তু যখনই উল্লিখিত দুই শর্ত অনুসরণ করে এসব হিসেবপত্তর সুনির্দিষ্ট আসন ধরে-ধরে মেলানো হয় (অর্থাৎ matching seats), তখন সংখ্যাটি উভয়ের ক্ষেত্রেই দাঁড়ায় কমবেশি ৭০টি। সুতরাং আসন ধরে-ধরে মেলালে যে দলের জন্য যেসব আসন উল্লিখিত দুই শর্ত পূরণ করে ওই আসনগুলোই ওই দলের সুনির্দিষ্ট "ভিত্তি আসন" (যেখানে সরকার গঠন করতে পারুক অথবা না-পারুক—যেকোনো অবস্থাতেই প্রযোজ্য দল ওই আসনে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ ভোট পাবে, যা তাদের দলীয় ভোট)। একই পদ্ধতিতে হিসাব করলে অন্যান্য দলের ভিত্তি আসনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫টি।

সারণি ১: ভোটারের ধরন শ্রেণিবিভাজন, ভিত্তি ভোট, দোদুল্যমান ভোট, ভিত্তি আসন, পরিবর্তনীয় আসন

দল/ভৌগলিক অঞ্চল	**অপরিবর্তনীয় ভোট:** ভিত্তি ভোট/ দলীয় অনুগত ভোট/ মনস্থির ভোট/ সর্বনিম্ন ভোট	**পরিবর্তনীয় ভোট:** দলীয় অনুগত নন এমন ভোটার/ এখনও মনস্থির করেননি এমন ভোটার/ দোদুল্যমান ভোট
আওয়ামী লীগ বিএনপি অন্যান্য দল	৩০ শতাংশ ভোট ৩০ শতাংশ ভোট ১০ শতাংশ ভোট	৩০ শতাংশ ভোট
	৭০ শতাংশ ভোট	৩০ শতাংশ ভোট
আসনসংখ্যা (সমগ্র দেশ = ৩০০)	**ভিত্তি আসন: অপররিবর্তনীয় আসন ("সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন")** বেইজ আসন/ ফ্লোর আসন/ সর্বনিম্ন আসন	**পরিবর্তনীয় আসন ("বিজয়-অনিশ্চিত আসন")**
আওয়ামী লীগ বিএনপি অন্যান্য দল	৭০ (২৩.৩ শতাংশ) আসন ৭০ (২৩.৩ শতাংশ) আসন ১৫ (৫ শতাংশ) আসন	১৪৫ (৪৮.৩ শতাংশ আসন)
	১৫৫ (৫১.৭ শতাংশ আসন)	১৪৫ (৪৮.৩ শতাংশ আসন)
তন্মধ্যে **পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক অঞ্চল (দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল)** (১৯ জেলায় ৬৮ আসন)		
আওয়ামী লীগ বিএনপি অন্যান্য দল	২৫ (৮.৩ শতাংশ আসন) ১৬ (৫.৩ শতাংশ আসন) ৪ (১.৩ শতাংশ আসন)	২৩ (৭.৭ শতাংশ আসন)
	৪৫ (১৪.৯ শতাংশ আসন)	২৩ (৭.৭ শতাংশ আসন)
ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তরাঞ্চল (৪৯ জেলায় ২৩২ আসন)		
আওয়ামী লীগ বিএনপি অন্যান্য দল	৪৫ (১৫ শতাংশ আসন) ৫৪ (১৮ শতাংশ আসন) ১১ (৩.৭ শতাংশ আসন)	১২২ (৪০.৭ শতাংশ আসন)
	১১০ (৩৬.৭ শতাংশ আসন)	১২২ (৪০.৭ শতাংশ আসন)

ছক ২: বিভিন্ন দলের সম্ভাব্য "ভিত্তি আসন"

(যেসব দলের পক্ষে ওই আসনে ভিত্তি ভোট ৪০ শতাংশ বা তার অধিক, বিধায় আসন জেতা মোটামুটি নিশ্চিত; এসব আসনে জিততে দোদুল্যমান ভোটারদের যে ভোট দরকার, তা সম্ভাব্য বিজয়ী দল অপেক্ষাকৃত সহজে পেতে পারে)

বিভিন্ন দলের সম্ভাব্য ভিত্তি আসন

আওয়ামী লীগের ৭০টি সম্ভাব্য ভিত্তি আসন: গোপালগঞ্জ-১, গোপালগঞ্জ-২, গোপালগঞ্জ-৩, মাদারীপুর-১, মাদারীপুর-২, মাদারীপুর-৩, শরীয়তপুর-১, শরীয়তপুর-২, শরীয়তপুর-৩, ফরিদপুর-১, ফরিদপুর-৪, রাজবাড়ী-২, দিনাজপুর-২, দিনাজপুর-৩, রংপুর-৬, গাইবান্ধা-২, নওগাঁ-১, রাজশাহী-২, রাজশাহী-৬, নাটোর-৩, সিরাজগঞ্জ-১, পাবনা-৩, নড়াইল-২, বাগেরহাট-১, খুলনা-১, খুলনা-৩, বরগুনা-১, পটুয়াখালী-১, বরিশাল-১, ঝালকাঠি-২, টাঙ্গাইল-১, জামালপুর-৩, জামালপুর-৫, শেরপুর-২, ময়মনসিংহ-৭, নেত্রকোনা-৪, কিশোরগঞ্জ-১, কিশোরগঞ্জ-৪, কিশোরগঞ্জ-৬, ঢাকা-৩, ঢাকা-৫, ঢাকা-৯, ঢাকা-১০, ঢাকা-১১, ঢাকা-১৩, ঢাকা-১৮, গাজীপুর-২, গাজীপুর-৩, নরসিংদী-৪, নারায়ণগঞ্জ-১, নারায়ণগঞ্জ-২, সুনামগঞ্জ-৩ সিলেট-৩, সিলেট-৪, মৌলভীবাজার-৪, হবিগঞ্জ-১, হবিগঞ্জ-৩, কুমিল্লা-৫, কুমিল্লা-৬, কুমিল্লা-৭, কুমিল্লা-৯, চাঁদপুর-১, চাঁদপুর-৩, চাঁদপুর-৫, নোয়াখালী-৪, চট্টগ্রাম-৬, কক্সবাজার-৪, পার্বত্য রাঙামাটি, পার্বত্য বান্দরবন

বিএনপির ৭০টি সম্ভাব্য ভিত্তি আসন: ফেনী-১, ফেনী-২, ফেনী-৩, নোয়াখালী-১, নোয়াখালী-২, নোয়াখালী-৩, নোয়াখালী-৬, লক্ষ্মীপুর-১, লক্ষ্মীপুর-২, লক্ষ্মীপুর-৩, লক্ষ্মীপুর-৪, দিনাজপুর-৬, জয়পুরহাট-১, জয়পুরহাট-২, বগুড়া-১, বগুড়া-২, বগুড়া-৩, বগুড়া-৪, বগুড়া-৫, বগুড়া-৬, বগুড়া-৭, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২, নওগাঁ-৪, নওগাঁ-৬, রাজশাহী-১, রাজশাহী-৪, রাজশাহী-৫, নাটোর-১, নাটোর-৪, সিরাজগঞ্জ-২, সিরাজগঞ্জ-৫, মেহেরপুর-২, কুষ্টিয়া-৪, চুয়াডাঙ্গা-১, ঝিনাইদহ-২, ঝিনাইদহ-৪, যশোর-৪, যশোর-৬, মাগুড়া-২, খুলনা-২, সাতক্ষীরা-১, বরিশাল-২, বরিশাল-৪, বরিশাল-৫, ভোলা-৩, জামালপুর-৪, নেত্রকোনা-৩, মুন্সিগঞ্জ-৩, নরসিংদী-১, নারায়ণগঞ্জ-৪, রাজবাড়ী-১, হবিগঞ্জ-৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪, কুমিল্লা-২, কুমিল্লা-৩, কুমিল্লা-৮, চাঁদপুর-৪, সিলেট-২, চট্টগ্রাম-২, চট্টগ্রাম-৫, চট্টগ্রাম-৭, চট্টগ্রাম-৯, চট্টগ্রাম-১০, চট্টগ্রাম-১৫, চট্টগ্রাম-১৬, কক্সবাজার-১, কক্সবাজার-৩।

অন্যান্য দলের ১৫টি সম্ভাব্য ভিত্তি আসন: জাতীয় পার্টির ১১টি—রংপুর-১, রংপুর-২, রংপুর-৩, লালমনিরহাট-২, লালমনিরহাট-৩, নীলফামারী-১, ঠাকুরগাঁও-৩, কুড়িগ্রাম-১, কুড়িগ্রাম-২, কুড়িগ্রাম-৩, চট্টগ্রাম-৪; **জামায়াতে ইসলামীর ২টি**-চট্টগ্রাম-১৪, কক্সবাজার-২; **এনডিপির ১টি**-চট্টগ্রাম-১৩, **বিজেপির ১**টি-ভোলা-১।

বি. দ্র.: "ভিত্তি আসন'-এর সংজ্ঞা পরিবর্তিত হলে বিভিন্ন দলের আসনভিত্তিক "ভিত্তি আসন' চিত্র ভিন্ন হতে পারে। "ভিত্তি আসন"-এর সংজ্ঞা যত বেশি রক্ষণশীল হবে, "ভিত্তি আসন" সংখ্যা তত কম হবে (উল্টোটা হবে যদি সংজ্ঞা আরও উদার করা হয়)। তবে সংজ্ঞা যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিবর্তন করলেও আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ভিত্তি আসনসংখ্যা প্রায় সমান-সমান হয়।

আমাদের হিসাবে দেশের ৩০০টি সংসদ আসনের মধ্যে ১৫৫টি আসন হলো "ভিত্তি আসন" বা "সম্ভাব্য বিজয় নিশ্চিত আসন"। "ভিত্তি আসন"-এর সংজ্ঞার সাথে এ ধরনের আসনের দলভিত্তিক সংখ্যার সম্পর্ক এবং এ ধরনের আসনের বিজয়-নিশ্চিত "সম্ভাবনা" সম্পর্কে এখানে "ভিত্তি আসন" নিয়ে দু'টো কথা বলা প্রয়োজন: (১) আমরা "ভিত্তি আসন" সংখ্যা নিয়ে যা বলছি সংখ্যাটা তার চেয়ে কম বা বেশি হতে পারে যদি "ভিত্তি আসন" নিরূপণের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হয়। "ভিত্তি আসন"-এর সংজ্ঞা আরো রক্ষণশীল হলে (যেমন ৪০ শতাংশের ভিত্তি ভোটের পরিবর্তে ৫০ শতাংশ ভিত্তি ভোট যদি মানদণ্ড হয়) ভিত্তি আসনসংখ্যা কমে যাবে। আবার তা আরো উদার হলে (যেমন ৪০ শতাংশ ভিত্তি ভোটের পরিবর্তে ৩৬ শতাংশ ভিত্তি ভোট যদি মানদণ্ড হয়) ভিত্তি আসনসংখ্যা বেড়ে যাবে। কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি, "ভিত্তি আসন"-এর সংজ্ঞা পরিবর্তিত হলেও আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ভিত্তি আসনসংখ্যা প্রায় সমান-সমান হয়। তবে "ভিত্তি আসন"-এর সংজ্ঞা "নিজের সুবিধে মতো" বা 'নিজের মন মতো' বা "নিজের জন্য যুঁতসই" (convenience) করাটা আর যাই হোক বিজ্ঞানসম্মত হবে না। (২) "ভিত্তি আসন" হলো **"সম্ভাব্য** বিজয়-নিশ্চিত" আসন। "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত" আসনে কোনো একটি দলের "বিজয় সম্ভাবনা" ১০০ শতাংশ নয় (যদি তাই-ই হতো, তাহলে "সম্ভাব্য" বলা হতো না)। যেহেতু এ ধরনের আসনে "বিজয়-নিশ্চিত সম্ভাবনা" সুনির্দিষ্ট কোনো একটি দলের পক্ষে, সেহেতু ওই আসনে ওই দল তার বিজয়-নিশ্চিত সম্ভাবনাকে পূর্ণ বাস্তবে রূপ দিতে চাইবে; আর একই সাথে প্রতিপক্ষ দল চাইবে ওই আসনটি ছিনিয়ে নিতে। গেম থিউরির সূত্রানুসারে ওই আসনে প্রতিপক্ষ দল প্রার্থী পরিবর্তন করে তাদের ধারণায় "শক্ত প্রার্থী" দাঁড় করাতে পারে। যেহেতু দুই পক্ষই এসব করবে, সেহেতু দুই পক্ষের কিছু "ভিত্তি আসন" বা "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন" হয়তো বা একপক্ষের হাত থেকে অন্যপক্ষের হাতে চলে যাবে। কিন্তু তাতে করে দুই পক্ষের "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন"-এর নিট সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হবে না। কারণ, উভয় পক্ষই একই কৌশল অবলম্বন করবে। এ ক্ষেত্রে উভয়েই একই বিষয় নিশ্চিত করতে চাইবে, উভয়েই চাইবে— দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট নিজের পক্ষে সর্বোচ্চকরণ করতে (অন্য সবকিছু হবে গৌণ বিষয়)।

"ভিত্তি আসন" বা "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন"সংশিষ্ট ভাবনায় ভৌগলিক অবস্থানগত একটি বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। বিষয়টি হলো—"পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক অঞ্চল" (অর্থাৎ দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলকেন্দ্রিক)

এবং ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তরাঞ্চলে ভিত্তি আসনসংখ্যার বণ্টন ও দলভিত্তিক তুলনামূলক আধিক্য (দেখুন সারণি ১ ও ছক ১)।

আমাদের হিসাবে দেশের মোট ১৫৫টি ভিত্তি আসনের মধ্যে ৪৫টি (২৯ শতাংশ ভিত্তি আসন) আছে পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক—দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে, আর ১১০টি (৭১ শতাংশ ভিত্তি আসন) আছে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলে। ভিত্তি আসন-এর তুলনামূলক আধিক্যে ভৌগলিক বিভাজনটা এ রকম: দেশের দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে মোট আসনসংখ্যা (৬৮টি) সারা দেশের মোট আসনের ২২.৭ শতাংশ হলেও এ অঞ্চলে ভিত্তি আসনসংখ্যা সারা দেশের ভিত্তি আসনসংখ্যার ২৯ শতাংশ, আর ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলের জন্য এসব অনুপাত যথাক্রমে ৭৭ শতাংশ ও ৭১ শতাংশ (সারণি ১ থেকে হিসাবকৃত)।

আমাদের হিসেবে "পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক অঞ্চল"-এর ১৯টি জেলার মোট ৬৮টি আসনের মধ্যে মোট ভিত্তি আসনসংখ্যা ৪৫টি (এ অঞ্চলের মোট আসনের ৬৬.২ শতাংশ)। এই অঞ্চলে আওয়ামী লীগের ভিত্তি আসনসংখ্যা বিএনপির চেয়ে বেশি—আওয়ামী লীগের ২৫টি, আর বিএনপির ১৬টি। আবার ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলের ৪৯টি জেলার মোট ২৩২টি আসনের মধ্যে মোট ভিত্তি আসনসংখ্যা ১১০টি (এ অঞ্চলের মোট আসনের ৪৭.৪ শতাংশ)। এই অঞ্চলে বিএনপির ভিত্তি আসনসংখ্যা আওয়ামী লীগের ভিত্তি আসনসংখ্যার তুলনায় বেশি—বিএনপির ৫৪টি, আর আওয়ামী লীগের ৪৫টি। উল্লিখিত দুই ভৌগলিক অঞ্চলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বাইরেও অন্যান্য দলের ভিত্তি আসন আছে। যেমন অন্যান্য দলের ভিত্তি আসনসংখ্যা পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক অঞ্চলে ৪টি আর দেশের পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলে ১১টি।

লক্ষণীয় যে "ভিত্তি আসন"-এর দলভিত্তিক বণ্টন একধরনের ভৌগলিকত্ব (বা ভৌগলিক অবস্থান) অনুসরণ করে। দেশের দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে—গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, খুলনায় আওয়ামী লীগের ভিত্তি আসনসংখ্যা বিএনপির তুলনায় অনেক বেশি; আবার পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায়—ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বগুড়া, জয়পুরহাট ও চট্টগ্রামে বিএনপির ভিত্তি আসনসংখ্যা আওয়ামী লীগের তুলনায় অনেক বেশি; উত্তরাঞ্চলের রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে জাতীয় পার্টির ভিত্তি আসনসংখ্যা অন্যসব দলের তুলনায় বেশি। এসবের কার্যকরণ রাজনীতিবিজ্ঞানীরা ভেবে দেখতে পারেন।

'ভোটারের মন' বুঝতে প্রথমেই আমরা ভোটারদের দু'ভাগে বিভক্ত করেছি। **প্রথম ভাগে** আছেন সেইসব ভোটার, যারা কোথায় ভোট দেবেন তা ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছেন (ধরন-১ ভোটার)—আমরা বলছি এসব ভোটার হলেন তারা, যারা সবকিছু ওলটপালট হলেও আসন্ন ২০২৪ নির্বাচনে কোন দলে ভোট দেবেন সে বিষয়ে মনস্থির করেছেন—যা পরিবর্তন হবে না। এরা হলেন "দলীয় অনুগত ভোটার" (মনস্থির ভোটার)। এদের আমরা বলছি "ভিত্তি ভোটার" (base voter)। অতীতের "অপেক্ষাকৃত ভালো" নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা এসব ভোটার খুঁজে পেয়েছি। তারই ভিত্তিতে আমরা যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছি যে, আসন্ন ২০২৪-এর নির্বাচনে ১২ কোটি ভোটারের মধ্যে এসব "মনস্থির ভোটারের" দলগত বিভাজনটা হতে পারে এ রকম: ৩০ শতাংশ আওয়ামী লীগ, ৩০ শতাংশ বিএনপি, ১০ শতাংশ অন্যান্য দল (স্বতন্ত্রসহ)। যতই ওলটপালট হোক না কেন অতীতকাল (অন্তত অতীতের চারটি অপেক্ষাকৃত ভালো নির্বাচন—১৯৯১, ১৯৯৬ জুন, ২০০১, ২০০৮) যদি কোনো মানদণ্ড হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এই প্যাটার্ন (প্রবণতা) খুব একটা পরিবর্তন হবে না। আমাদের হিসাবে 'দলীয় অনুগত ভোটার' বা 'মনস্থির ভোটার' অথবা একই কথা 'ভিত্তি ভোটার'রা হলেন মোট ভোটারের ৭০ শতাংশ। এর অর্থ বাদবাকি ৩০ শতাংশ ভোটার (১০০–৭০) হলেন তারা—যারা "দলীয় অনুগত ভোটার নন" অথবা যারা "কাকে ভোট দেবেন সে বিষয়ে এখনও মনস্থির করেননি"। এরাই হলেন **দ্বিতীয় ভাগ** ভোটার—"দোদুল্যমান ভোটার" (ধরন-২ ভোটার)। এই ৩০ শতাংশ ভোটার, যারা "এখনও মনস্থির করেননি যে কাকে ভোট দেবেন"—এদের ভোটেই ১৪৫টি আসনে (যেসব আসনকে আমরা বলছি "বিজয়-অনিশ্চিত আসন") জয়-পরাজয় নিশ্চিত হবে, যা দিয়েই চূড়ান্ত বিজয় নির্ধারিত হবে। আমরা হিসাব করে দেখেয়েছি যে, একটি আসনে সে জিতবে, যে এসব ভোটারের ৫৬ শতাংশ ভোট পাবে। অর্থাৎ এসব আসনে জিততে হলে "দলীয় অনুগত ভোট" পুরোটা পেতে হবে (মোট ভোটের ৩০ শতাংশ) আর তার সাথে পেতে হবে দোদুল্যমান ভোটারদের ৫৬ শতাংশ ভোট। উপরের দুই ধরনের ভোট যোগ করলে যে ৪৬ শতাংশ ভোট হবে তা দিয়েই "বিজয়-অনিশ্চিত আসনে" বড় দুই দলের মধ্যে যেকোনো দলের বিজয় নিশ্চিত হবে।

এসবই হলো মোটামুটি চিরাচরিত হিসেবের কথা। কিন্তু এসবের বাইরেও কিছু বাস্তব হিসেবপত্তর আছে, যা কেউই তেমন বলেন না (সম্ভবত কখনও বলেননি)। যেমন "ভিত্তি ভোট" যেমন আছে, তেমনই আছে "ভিত্তি আসন"। আমরা এ ধরনের আসনের সংজ্ঞাসহ হিসেবপত্তর দিয়ে ইতিমধ্যেই বলেছি যে, ভিত্তি আসন হলো সেইসব আসন, যা বড় দুই দল—আওয়ামী লীগ ও বিএনপি যেকোনো অবস্থাতেই পেয়ে যাবে। যেমন "দুর্গ আসন" অর্থাৎ এমন আসন, যেসব আসনে

কোনো একটি দলের ভিত্তি ভোট থাকে তুলনামূলকভাবে বেশি, দোদুল্যমান ভোটার থাকে কম এবং ঐতিহাসিকভাবেই (সম্ভবত সাংগঠনিক শক্তিশালী ভিত্তির কারণে) আসনটি পান ওই দল—যার ভিত্তি ভোট তুলনামূলক অনেক বেশি। আমাদের হিসেবে বড় দুই দলের ভিত্তি ভোট সমান—উভয়েরই ৩০ শতাংশ করে। এটা তো গড় অবস্থা। কিন্তু কোনো আসনে কোনো দলের ভিত্তি ভোট যদি ৪০ শতাংশ হয়, সেক্ষেত্রে জয়-পরাজয় নির্ধারণে দোদুল্যমান ভোটের তেমন কোনো গুরুত্ব থাকে না (অথবা গুরুত্ব থাকে কম)। অতীতের তুলনামূলক ভালো নির্বাচনের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে যেসব দল যেসব আসনে ৪০ শতাংশ ভিত্তি ভোট নিশ্চিত করতে পারে, তারা ওই আসনে জেতে—এসব আসন হলো "ভিত্তি আসন" (base seat)। এ হিসাবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি—প্রত্যেকের ভিত্তি আসন (অর্থাৎ "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন") সংখ্যা ৭০ হতে পারে। আর সব দল মিলে মোট ভিত্তি আসনসংখ্যা ১৫৫টি। আসন্ন নির্বাচনে ৩০০ আসনের জাতীয় সংসদে ভাগ্য নির্ধারক হবে ১৪৫টি "বিজয়-অনিশ্চিত আসন" (মোট আসনের ৪৮ শতাংশ)। এসব আসনের বিজয়-অবস্থাই শেষপর্যন্ত নির্ধারণ করবে যে কে সরকার গঠন করবে।

যেহেতু 'আওয়ামী লীগ" ও "বিএনপি" উভয়েরই ভিত্তি আসনসংখ্যা (বা সম্ভাব্য বিজয়-সুনিশ্চিত আসন) সমান উভয়েরই ৭০টি করে আসন, সেহেতু আসন্ন নির্বাচনে আসনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য উভয়েই সর্বাত্মক চেষ্টা করবে—এ এক সহজ পাটিগণিত। আর এই পাটিগণিতে দলীয় আসনসংখ্যা বাড়াতে উভয়েই যে চেষ্টাটি করবে, তা হলো "পরিবর্তনীয় আসনে" (বিজয়-অনিশ্চিত আসন) জোর দিতে; আর তা করতে হলে ১৪৫টি পরিবর্তনীয় আসনে দোদুল্যমান ভোটারদের (৩০ শতাংশ ভোটার) মন এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে, যেন তাদের কমপক্ষে ৫৬ শতাংশ ভোট পাওয়া নিশ্চিত করা যায়। উভয় দলই এ চেষ্টাই করবে। কে কতটুকু সফলকাম হবে, তা নির্ভর করছে দোদুল্যমান ভোটারদের মনে কী আছে এবং প্রার্থীরা এসব মনে কীভাবে নাড়া দেবেন তার ওপর। দোদুল্যমান ভোটারদের মন বুঝতে এবং তাতে নাড়া দিতে হলে, বুঝতে হবে তাদের প্রত্যাশার কথা। আর তার চেয়েও বেশি বুঝতে হবে তাদের জীবন-জীবিকার বাস্তবতা এবং বয়স কাঠামোভিত্তিক প্রয়োজনীয় চাহিদার কথা।

"দোদুল্যমান ভোটার" কী দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন? কী বলা হবে? কেমন হতে পারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত?

আমরা ইতিমধ্যে "ভিত্তি আসন" বা "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন" ধারণাটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আর তার ভিত্তিতে হিসেবনিকেশ করে পেয়েছি যে, দেশের

৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ভিত্তি আসনসংখ্যা হবে ১৫৫টি। এই ১৫৫টি ভিত্তি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের আছে ৭০টি, বিএনপির ৭০টি, আর অন্যান্য দলের ১৫টি। প্রত্যেক দলের জন্য হিসাবকৃত এসব আসন পেতে প্রতিটি আসনে ৪০ শতাংশ ভোট পেতে হয়েছে, যা পুরাটাই দলীয় ভোটাররা দিয়েছেন; আর তার সাথে যুক্ত হয়েছে খুব কম দোদুল্যমান ভোট—মাত্র ৬ শতাংশ ভোট। কারও মোট প্রাপ্ত ভোটের ৪০ শতাংশ যদি দলীয় অনুগত ভোটারের ভোট হয়, সেক্ষেত্রে ওই ৬ শতাংশ অতিরিক্ত ভোট দোদুল্যমান ভোটারদের কাছে থেকে পাওয়া তেমন কঠিন কাজ নয়। এ তো গেল ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৫ আসনের কথা যা "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন"। বাকি ১৪৫টি আসনে (যা "বিজয়-অনিশ্চিত আসন") প্রার্থীদের ভাগ্য কীভাবে নির্ধারিত হবে। দোদুল্যমান ভোটাররা কেমন আচরণ করবেন, কাকে ভোট দেবেন—তা দিয়েই নির্ধারিত হবে ওই ১৪৫টি আসনে প্রার্থীর ভাগ্য।

এই ১৪৫টি "বিজয়-অনিশ্চিত" আসনের যেকোনো আসনে যেকোনো প্রার্থীকে জিততে হলে তাকে ৪৬ শতাংশ ভোট পেতে হবে। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, একটি গড় আসনে বড় দলের প্রার্থীদের প্রত্যেকেরই গড় দলীয় ভোট আছে ৩০ শতাংশ। জিততে হলে প্রার্থীকে আরও ১৬ শতাংশ ভোট পেতে হবে। আর এই ভোট আসার জায়গা একটাই—তা হলো দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট। দোদুল্যমান ভোটারের ভোটসংখ্যা (আমাদের হিসাবে) মোট ভোটারের ৩০ শতাংশ। জিততে হলে দোদুল্যমান ভোটারদের সব ভোট পাওয়ার দরকার হবে না (সেটা কেউ কোনো দিন পাবেনও না)—পেতে হবে দোদুল্যমান মোট ভোটের মাত্র ৫৬ শতাংশ। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ অথবা বিএনপির প্রার্থী, যিনি ১০০ জন দোদুল্যমান ভোটারের মধ্যে ৫৬ জনের ভোট পাবেন—তিনিই জিতবেন। প্রশ্ন হলো—এসব দোদুল্যমান ভোটার কারা, কী তাদের বৈশিষ্ট্য?

এসব দোদুল্যমান ভোটাররা যেমন নারী-পুরুষ আর গ্রাম-শহরে বিভাজিত, তেমনি তাদের একটি বয়সকাঠামো আছে। দোদুল্যমান ভোটারদের "ভোট প্রদান-উদ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ আচরণ" বুঝতে সম্ভবত এই বয়সকাঠামোটা জানা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সম্ভবত সব বয়সী ভোটার একই বিষয় একইভাবে বিবেচনা করে ভোট প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন না। আবার এমনও হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, বিভিন্ন বয়স গ্রুপে "দোদুল্যমান ভোটারের" অথবা "দলীয় অনুগত ভোটারের" অনুপাত একই রকম নয়।

দোদুল্যমান ভোটারদের অর্ধেক নারী, বাকি অর্ধেক পুরুষ—এদের ৭০ শতাংশ গ্রামে থাকেন, বাকি ৩০ শতাংশ শহরে। দোদুল্যমান ভোটারদের বয়সকাঠামো

যদি দেশের সব ভোটারের বয়সকাঠামো অনুপাতটাই অনুসরণ করে, তাহলে এদের বয়সকাঠামো হবে সম্ভবত এ রকম: ৩৪ শতাংশের বয়স ১৯-২৯ বছরের মধ্যে, ৫৫ শতাংশের বয়স ৩০-৫৯ এর মধ্যে, আর বাকি ১১ শতাংশের বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি (সারণি ২)। সবচেয়ে কম বয়সী ভোটার, যাদের বয়স ১৯-২৯ বছর, এরা ছাত্র-যুবক-তরুণ-নতুন ভোটার (যাদের ভোট প্রদান অভিজ্ঞতা ভালো নয়)—এরা হলেন মোট দোদুল্যমান ভোটারের ৩৪ শতাংশ। এর পরে আছে মধ্য বয়সী অর্থাৎ ৩০-৫৯ বয়সী ভোটার, যারা "পরিবারের অর্থনীতির পরিচালক"—এদের সবাই-ই পরিবার পরিচালনে কষ্ট-ক্লেশ করছেন; অনেক দুশ্চিন্তা এদের মনে। এরা হলেন দোদুল্যমান ভোটারের সবচেয়ে বড় অংশ—৫৫ শতাংশ। এবং তারপরে আছেন ৬০ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সী ভোটার—এরা বয়োজ্যেষ্ঠ, অপেক্ষাকৃত প্রবীণ, ধীর-স্থির প্রকৃতির অভিজ্ঞ মানুষ; এরা হলেন মোট দোদুল্যমান ভোটারের ১১ শতাংশ। যদি এমনটি হয় যে কমবয়সী ভোটারদের বড় অংশই এখনও মনস্থির করেননি যে কাকে ভোট দেবেন, সেক্ষেত্রে এমনটিও হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে—তারা মোট ভোটারের ৩৪ শতাংশ হলেও হতে পারেন দোদুল্যমান ভোটারদের ৪০ শতাংশ। আর সেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কমবয়সী দোদুল্যমান ভোটাররাই হয়ে যেতে পারেন প্রার্থীদের ভাগ্যনির্ধারক। তবে এ কথা নিশ্চিত যে বয়সনির্বিশেষে দোদুল্যমান ভোটারের সিদ্ধান্তই হবে বিজয়নির্ধারক ভোট।

সারণি ২: বাংলাদেশে ভোটারদের বয়সকাঠামো

বয়স গ্রুপ	মোট ভোটারের শতাংশ	মোট ভোটার
১৯-২৯ বছর	৩৪ শতাংশ	৪ কোটি ৮ লক্ষ
৩০-৫৯ বছর	৫৫ শতাংশ	৬ কোটি ৬০ লক্ষ
৬০ বছর ও বেশি	১১ শতাংশ	১ কোটি ৩২ লক্ষ
সর্বমোট	১০০ শতাংশ	**১২ কোটি**

দেশে দোদুল্যমান ভোটারের সংখ্যা হবে আনুমানিক ৩ কোটি ৬০ লক্ষ (মোট ভোটারের ৩০ শতাংশ)। দোদুল্যমান ভোটারদের "ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত গ্রহণসংশ্লিষ্ট মন" কীভাবে কাজ করে, তা সম্ভবত বহুলাংশে নির্ভর করবে এসব ভোটারের বেশকিছু আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যের ওপর। বয়সকাঠামো অনুযায়ী এসব ভোটারের জীবনচাহিদা যে গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি। তবে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বড় মাপের নির্ণায়ক হতে পারে। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে বেকারত্ব (দোদুল্যমান ভোটারদের মধ্যে কার্যত বেকার হবেন ৭৫ লক্ষ); কৃষিসহ অনানুষ্ঠানিক খাতে স্বল্পমজুরির-স্বল্পআয়ী মানুষ

(প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ, দোদুল্যমান ভোটারদের ৩৫ শতাংশ); অন্যের আয়ের ওপর নির্ভরশীল মানুষসহ অবসরপ্রাপ্ত, শারিরীকভাবে ভঙ্গুর, সঞ্চয় ভেঙে চলা মানুষ (প্রায় ২ কোটি, দোদুল্যমান ভোটারদের ৫৬ শতাংশ), এবং ছাত্র (প্রায় ৭৫ লক্ষ, দোদুল্যমান ভোটারদের ২০ শতাংশ)। এসব হিসেবপত্তর ঠিক হলে দোদুল্যমান ভোটারদের বড় অংশই হবেন যথেষ্টমাত্রায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ। আর এসব মানুষের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে—তাদের জীবন-জীবিকাসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। সবকিছুর মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি আর পাশাপাশি আয়-উপার্জন না বাড়া—এসব কারণে গত দুই বছরে দোদুল্যমান ভোটারদের জীবন-জীবিকায় যে অধোগতি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে তাদের শারিরীক ও মানসিক পীড়াসহ জীবনে বড় ধরনের অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"দোদুল্যমান ভোটার" অর্থাৎ "কোথায় ভোট দেবেন তা যারা এখনও চূড়ান্ত করেননি"—এই বর্গের ভোটাররাই (ধরন-২ ভোটার) নির্ধারণ করবেন—কে জিতবে-কে হারবে। কারণ, ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৫টি (মোট আসনের ৫২ শতাংশ) "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত" আসনের যে চিত্র আমরা পেয়েছি, তা দিয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। এবারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে বাকি ১৪৫টি "বিজয়-অনিশ্চিত আসন"-এর সম্ভাব্য ফলাফলের ভিত্তিতে। আর ওই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নির্ধারণ করবে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট।

"বিজয়-অনিশ্চিত" এই ১৪৫টি আসনের প্রতিটির গড় ভোটারসংখ্যা ৪ লক্ষ, আর দোদুল্যমান ভোটার হবেন ১ লক্ষ ২০ হাজার। তবে কোনো প্রার্থীকে জিততে হলে, দোদুল্যমান ভোটারদের সব ভোট বা বেশির ভাগ ভোট পাওয়ার ব্যাপার নেই। কারণ, বড় দুই দলের (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যেক আসনে দলীয় অনুগত ভোটার আছেন ১ লক্ষ ২০ হাজার (ভিত্তি ভোট), এই ভোটের সাথে যে আরো ৬৪ হাজার ভোট—দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট যুক্ত করতে পারবে, সে-ই জিতবে (কারণ জিততে হলে দরকার হবে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ভোট অথবা মোট ভোটের ৪৬ শতাংশ)। তবে ভোটার উপস্থিতির হার অথবা ভোট প্রদানের হার ৭০ শতাংশ হলে ৪ লক্ষ ভোটারের আসনে ভোট দেবেন ২ লক্ষ ৮০ হাজার। জিততে লাগবে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৮০০ ভোট (৪৬ শতাংশ)। যার মধ্যে দলীয় অনুগত ভোট ৮৪ হাজার, আর দোদুল্যমান ভোটের অংশ হিসেবে আছে ৪৪ হাজার ৮০০ ভোট। এর অর্থ হলো এইই যে, দোদুল্যমান ভোটারদের (অর্থাৎ "যারা ভোট কোথায় দেবেন তা এখনও পর্যন্ত ঠিক করেননি) ভোটের ৫৬ শতাংশ পেলেই বিজয়-নিশ্চিত অর্থাৎ তাদের ভোটের ৪৪ শতাংশ না পেলেও অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন "এখনও মনস্থির

না করা এসব ভোটার" বা "দোদুল্যমান ভোটার"-এর মনে কী আছে? তারা কী ভাবছেন? তাদের ভোটকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্ব কীভাবে কাজ করবে? তারা কী ভেবে কার পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন?

দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট পাওয়ার জন্য (ক্ষমতাসীন) সরকারি দল (আওয়ামী লীগ) এবং বিরোধী দল (বিএনপি ও তাদের মিত্র দল) উভয়েই মরিয়া হবে—এটাই স্বাভাবিক। উভয়েই ভোটারের মনের মধ্যে এমনভাবে ঢুকতে চাইবে, যাতে করে ভোটার তার পক্ষে ভোটদানের সিদ্ধান্ত নেন। আবার ভোটারের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতের পাশাপাশি উভয়েই সম্ভাব্য সব প্রচার-যোগাযোগমাধ্যমই ব্যবহার করবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অবিরত তথ্য দিতে থাকবে। ভোটারের মন পেতে (জয় করতে) প্রার্থীরা অনেক বিষয় সামনে আনবেন। বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রার্থীরা আত্মরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক বক্তব্য প্রচার করবেন। ভোটাররা এর সবই শুনবেন, নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা দিয়ে এসব বক্তব্য 'ফিল্টার' করবেন, চাওয়া-পাওয়া মেলাবেন এবং সব শেষে ভোটকেন্দ্রে গোপন ব্যালটে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। তবে এ প্রক্রিয়ায় কেউ জানতেই পারবে না—কোন ভোটার কী মনে করে শেষ সিদ্ধান্তটি নিলেন। এসব ভোটার ভোটের আগে সম্ভবত কাউকেই বলেন না কী হলে বা কী করলে—তিনি নির্দিষ্ট কাউকে ভোট দেবেন। এসবই যথেষ্ট অনিশ্চিত ব্যাপার, তবে নিশ্চিত যে "দোদুল্যমান ভোটার" শেষপর্যন্ত নির্দিষ্ট কাউকে সুনির্দিষ্ট কারণে ভোট দিচ্ছেন/দিলেন। ভোটপ্রত্যাশী প্রার্থীর জন্য এসব খুবই অনিশ্চিত অবস্থা। কারণ, প্রার্থী শুধু জানেন যে, "অনেক ভোটার আছেন, যারা এখনও মনস্থির করেননি" (তবে সুনির্দিষ্টভাবে তারা কারা, তা প্রার্থী জানেন না); জানেন শুধু এসব ভোটার ভোট দেবেন এবং প্রত্যেকের আছে এক ভোট—জিততে হলে এই ভোটটিই আমার দরকার, আর এ জন্য সুনির্দিষ্ট বক্তব্যসহ প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।

এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন হলো, সরকারি দল (আওয়ামী লীগ) আর বিরোধী দল (বিএনপি ও তাদের মিত্রদল)-এর প্রার্থীরা ভোটারদের সামনে কী কী বক্তব্য নিয়ে আসবেন—যা দেখে ভোটাররা, বিশেষত দোদুল্যমান ভোটাররা (যারা কাকে ভোট দেবেন, তা নিয়ে এখনও মনস্থির করেননি, অর্থাৎ ৩০ শতাংশ ভোটার) কে কোথায় ভোট দেবেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত প্রভাবান্বিত করতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থীরা প্রণিধানযোগ্য যেসব বিষয় উত্থাপন করবেন, তার মধ্যে থাকবে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড (অবকাঠামোগত বিষয়াদি মেগা প্রজেক্ট, পদ্মা সেতু,

বিদ্যুৎ, সার্বজনীন পেনশন); সামষ্টিক অর্থনীতি (জিডিপি, প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, প্রবাসী আয়, আমদানি-রপ্তানি, খেলাপি ঋণ ইত্যাদি); ঘুষ-দুর্নীতি-কালোটাকা-অর্থপাচার; দ্রব্যমূল্য; আইনশৃঙ্খলা-বিচার; সরকারি শাসন-সংস্কৃতি; মানবাধিকার; প্রযুক্তি-ডিজিটাল; ২০১৮-এর নির্বাচন; স্যাংশন (নিষেধাজ্ঞা; একই সাথে আন্তর্জাতিক বিষয় হিসেবে প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ ঘোষণা)। এসবের পাশাপাশি প্রত্যেক প্রার্থীই ভোটারদের অবগতি ও বিবেচনার জন্য আসনকেন্দ্রিক স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা হাজির করবেন।

সরকারি দল ও বিরোধী দল (পক্ষ-প্রতিপক্ষ) একই বিষয়ে বক্তব্য দেবেন—তবে বলবেন ভিন্ন কথা, দেবেন ভিন্ন যুক্তি। তাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য হবে খুবই সোজাসাপ্টা—"যেসব ভোটার এখনও তার ভোট প্রদান সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত করেননি, সে সিদ্ধান্তটি নিজের পক্ষে টানতে/প্রভাবান্বিত করতে চেষ্টা করা"। এ প্রক্রিয়ায় শেষপর্যন্ত কোন বক্তব্যে কে কত দূর সফল হবেন, তা উভয়েরই অজানা। এসব অজানা বিষয়ের সুরাহা হবে ভোটারের মন দিয়ে। অনেক কথাই আছে (থাকবে), যা ভোটারের মন পরিবর্তনে তেমন প্রভাব নাও ফেলতে পারে। আবার এমন অনেক কথাও থাকবে, যা ভোটারের মন ছুঁয়ে যাবে—মন পরিবর্তনে প্রভাব ফেলবে। এমনটা স্বাভাবিক যে, যে বিষয়ে সরকারি দল আত্মরক্ষামূলক বক্তব্য দেবে, একই বিষয়ে বিরোধী দল হবে আক্রমণাত্মক। উল্টোটাও হবে। একই বিষয়ে সরকারি দল যখন ইতিবাচক বক্তব্য দেবে, তখন বিরোধী দল দেবে নেতিবাচক বক্তব্য। এসব ইতিবাচক-নেতিবাচক বিষয়াদি ভোটার শুনবেন, মানা না-মানা, গ্রহণ-বর্জন শেষে ভোটার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেবেন এবং ভোটটা সে অনুযায়ীই দেবেন। এটাই সাধারণ সূত্র।

কোনো ধরনের দ্বিধা-সংশয়-দ্ব্যর্থবোধ যেন না থাকে, এ জন্য পুনরাবৃত্তি হলেও আরেকটু এগোনোর আগে বলে রাখা দরকার—সরকারি দল-বিরোধী দল যে বিষয়ে যে বক্তব্যই দিক না কেন, তা ৭০ শতাংশ ভোটারের মন পরিবর্তন করবে না অথবা মন পরিবর্তনে তেমন প্রভাব ফেলবে না। কারণ, ৭০ শতাংশ ভোটার হলেন "মনস্থির ভোটার", "ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভোটার"—এরা হলেন "দলীয় অনুগত ভোটার"। প্রার্থী যে বক্তব্যই দিক না কেন এবং তার স্বপক্ষে যত যুক্তিই দিক না কেন, যত ধরনের প্রচারমাধ্যমই ব্যবহার করুক না কেন—একটি গড় আসনে ভিত্তি ভোট হিসেবে (যা সর্বনিম্ন ভোট) ৩০ শতাংশ ভোট পাবে আওয়ামী লীগ, ৩০ শতাংশ ভোট পাবে বিএনপি, ১০ শতাংশ ভোট পাবে অন্যান্য দল (স্বতন্ত্রসহ)। বাকি যে ৩০ শতাংশ যাদের আমরা বলছি "এখনও ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেননি, "যারা দলীয় অনুগত-স্থায়ী ভোটার নন, "দোদুল্যমান ভোটার"—এদের সিদ্ধান্তই হবে বিজয় নির্ধারণে চূড়ান্ত। সুতরাং

যৌক্তিক বিচারে সরকারি দল-বিরোধী দল যে বক্তব্যই হাজির করুন না কেন, তাদের মূল উদ্দেশ্য হবে—এসব "এখনও মনস্থির না করা ভোটারের" মনের মধ্যে ঢুকে ওই ভোটটি নিজের পক্ষে নেওয়া—ওই ভোটটি পাওয়া নিশ্চিত করা। তবে নির্বাচনে জিততে হলে এসব দোদুল্যমান ভোটারের সবার ভোট (পাওয়া) প্রয়োজন হবে না (কেউই কোনো দিন তা পাবেনও না)। দোদুল্যমান ভোটারদের (যারা মোট ভোটারের ৩০ শতাংশ) ৫৬ শতাংশ ভোট (যা মোট ভোটের ১৬ শতাংশ) যিনি পাবেন তিনিই জিতবেন। কারণ, বড় দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রত্যেকের হাতে "দলীয় অনুগত" ভোট হিসেবে ইতিমধ্যে ৩০ শতাংশ ভোট রিজার্ভ আছে (জিততে লাগবে ৪৬ শতাংশ ভোট)। কাজটি আদৌ সরলরৈখিক নয়। কাজটি জটিল ও কঠিন। কেন? সম্ভাবনাগুলো কেমন?

দেশে ৩০ শতাংশ ভোটার আছেন, যারা "দলীয় অনুগত ভোটার নন" অথবা যারা "দলীয় স্থায়ী ভোটার নন", যারা "এখনও তাদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেননি", অথবা যারা "বড় দুই দলের কোনো দলের প্রার্থীকে ভোট দেবেন, সে বিষয়ে এখনও ভাবছেন, এখনও মনস্থির করেননি"—এসব ভোটারই ভোট লড়াইয়ের নায়ক। কারণ, এদের ভোট দিয়েই বিজয় (পরাজয়) নিশ্চিত হবে। জিতবেন তিনি, যিনি এদের ৫৬ শতাংশ ভোট পাবেন। এসব ভোটারের মন জয় করতেই সরকারি (আওয়ামী লীগ) ও বিরোধী দলীয় (বিএনপি) প্রার্থীরা মোটামুটি ৯ গুচ্ছ বিষয়ে বক্তব্য হাজির করবেন। ভোটারের মনে এসব বক্তব্যের সম্ভাব্য প্রভাব কেমন হবে সম্ভবত তা দিয়েই নির্ধারিত/নিশ্চিত হবে ভোটার কোন দিকে যাবেন, কাকে ভোট দেবেন। দোদুল্যমান ভোটারদের মনে ৯ গুচ্ছ এসব বক্তব্যের সম্ভাব্য প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে, তা নিচে উত্থাপন করছি (সংক্ষেপচিত্র সারণি ৩-এ দেখানো হয়েছে)।

আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা সবচে বেশি যে বিষয় নিয়ে প্রচার করবেন, তা হলো **"উন্নয়ন"**, যার মধ্যে থাকবে বিভিন্ন অবকাঠামো, মেগা প্রজেক্ট-পদ্মা সেতু ও ঢাকার মেট্রোরেলসহ অন্যান্য, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, সার্বজনীন পেনশন ইত্যাদি। সম্ভবত "উন্নয়ন" প্রসঙ্গই হবে আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী কৌশল। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে আওয়ামী লীগ বলবে এসব করে তারা উন্নয়নের গতি বাড়িয়েছে, দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তুলেছে; বলবে ভবিষ্যতের শক্তিশালী অর্থনীতির জন্য এসবই হলো "উন্নয়ন অত্যাশ্চর্য"; তথ্যপ্রমাণসহ বোঝানোর চেষ্টা করবে কোন মেগা প্রজেক্ট দিয়ে জনগণের কী এবং কত ধরনের লাভ হয়েছে ও ভবিষ্যতে হবে। মেগা প্রজেক্টভিত্তিক উন্নয়ন ভাবনার পথিকৃৎ এবং সফল

বাস্তবায়নকারী হিসেবে আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করবে। মেগা প্রজেক্টসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের অবস্থান হবে যথেষ্ট মাত্রায় প্রত্যয়ী, গ্রহণযোগ্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে আক্রমণাত্মক। এ ধরনের অবস্থানের পেছনে দুটো কারণ কাজ করবে: (১) আওয়ামী লীগ সরকার এসব কাজ বাস্তবেই করেছে—যা দৃশ্যমান, (২) আওয়ামী লীগ জানে যে প্রতিপক্ষ বিএনপি এসব নিয়ে যথেষ্ট মাত্রায় প্রতি-আক্রমণ করবে। বিএনপি—এসব মেগা প্রজেক্টের সমালোচনা করে যা-যা বলবে তার মধ্যে থাকবে: ওইসব প্রজেক্টে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে, টাকা লোপাট করা হয়েছে—দুর্নীতি হয়েছে-মাত্রাতিরিক্ত, এসব দুর্নীতি করে শাসকগোষ্ঠী কালোটাকা বানিয়েছে এবং তা বিদেশে পাচার করেছে, ওইসব প্রজেক্ট ছিল অপ্রয়োজনীয়, মেগা প্রজেক্টের জন্য নেওয়া বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে দেশ ফকির হয়ে যাবে, বিদ্যুৎ যখন দরকার তখন থাকে না—লোডশেডিং অতিরিক্ত, বিদ্যুতের দাম অত্যধিক, বিদ্যুৎ টাকা বানানোর কৌশল (বিএনপি তাদের বক্তব্য প্রমাণে কিছু হিসেবপত্তরও দেবে)। মেগা প্রজেক্টসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়াদি নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী যে কথাবার্তা বলবে/বক্তব্য দেবে তা দোদুল্যমান ভোটারদের (৩০ শতাংশ ভোটার) সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় কী ধরনের প্রভাব ফেলবে? সম্ভবত বেশির ভাগ মেগা প্রজেক্টের ক্ষেত্রেই তা হবে মিশ্র। আর এর অর্থ হতে পারে—ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণে এসব তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না (বেশির ভাগের কাছে এসব হতে পারে "আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর রাখার মতো")। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে "পদ্মা সেতু মেগা প্রজেক্ট", যার প্রভাব পড়তে পারে দেশের দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ১৯ জেলার ৬৮টি আসনে—প্রভাবের গতিমুখ হবে আওয়ামী লীগের পক্ষে (বিষয়টি পরে বলছি)। তবে "পদ্মা সেতু" যেহেতু ৬৮টি আসনে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রভাব ফেলতে পারে, সেহেতু "পদ্মা সেতু" প্রসঙ্গে বিএনপির মূল কথা হবে "দুর্নীতি"কেন্দ্রিক। "পদ্মা সেতু মানুষের উপকারে আসছে"—এ কথা বিএনপি খুব বেশি উচ্চারণ করবে না। তবে পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক দুর্নীতি-অপচয়ের কথা বিএনপিকে বলতেই হবে অন্তত এ কারণেও যে পদ্মা সেতুর সরাসরি উপকারভোগী অঞ্চলের ৬৮টি আসনের মধ্যে ১৬টি আসন বিএনপির "ভিত্তি আসন" (সারণি ১ দেখুন) যেসব আসন কোনো অবস্থাতেই বিএনপি হারাতে চাইবে না।

সারণি ৩: ২০২৪ নির্বাচনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বড় দল (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) যেসব বক্তব্য নিয়ে হাজির হবেন এবং তা "দোদুল্যমান ভোটারদের" (যাদের ভোটে জয়-পরাজয় নিশ্চিত হবে) ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে সম্ভাব্য কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে

	বক্তব্য বিষয়গুচ্ছ	আওয়ামী লীগের বক্তব্য (অবস্থান)	বিএনপির বক্তব্য (অবস্থান)	দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব/ প্রতিক্রিয়া
১।	উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড: (মেগা প্রজেক্ট) অবকাঠামো, পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, টানেল, বিদ্যুৎ, সামাজিক নিরাপত্তা, সার্বজনীন পেনশন ইত্যাদি	**[সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে]** ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ দেশের উন্নয়নে অবকাঠামোর অবদান ও সরকারের ভূমিকা; পদ্মা সেতু বিষয়ে জোর; অতীতের সাথে তুলনা; উন্নয়নে শেখ হাসিনার মডেল ও নেতৃত্ব; বিএনপি শাসনামলের দুর্নীতি	সমালোচনা করবে: অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়, দুর্নীতি-লুটপাট, অপ্রয়োজনীয়তা	– দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৬৮টি আসনে পদ্মা সেতুর প্রভাব থাকবে— **আওয়ামী লীগের পক্ষে** – দোদুল্যমান ভোটাররা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শেখ হাসিনার যোগ্যতা-দক্ষতা স্বীকার করবেন, তবে তা তাদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে তেমন প্রভাব ফেলবে না
২।	সামষ্টিক অর্থনীতি: মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), প্রবৃদ্ধি, বাজেট, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, প্রবাসী আয়, টাকার	তথ্যভিত্তিক কথাবার্তা: ২০০৬ সালকে ভিত্তি ধরে উন্নতির কথা বলবে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক; বৈশ্বিক পরিস্থিতিসহ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে দায়ী করা; দক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা	আগ্রাসী-আক্রমণাত্মক অবস্থান; তলানীতে অর্থনীতি; অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা	দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না

সারণি ৩... চলমান

	বিনিময় হার, আমদানি-রপ্তানি, খেলাপী ঋণ			
৩।	দুর্নীতি, কালোটাকা, অর্থপাচার	বিএনপির শাসনামল ছিল দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন (চরম আক্রমণাত্মক অবস্থান)	আওয়ামী লীগের শাসনামলে দুর্নীতি হয়েছে সর্বগ্রাসী (চরম আক্রমণাত্মক অবস্থান)	দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না
৪।	বৈষম্য-দারিদ্র্য	(বলবে) বৈষম্য কমেছে (উদাহরণ দেওয়া হবে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচির); দারিদ্র্য হ্রাসে পরিসংখ্যান দেওয়া হবে	(বলবে) সবধরনের বৈষম্য বেড়েছে (আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন); (বলবে) দুর্নীতি-অনাচার বৈষম্য বাড়িয়েছে	দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে সরাসরি তেমন প্রভাব ফেলবে না। প্রভাব হতে পারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সৃষ্ট বৈষম্য-দারিদ্র্যসংশ্লিষ্ট
৫।	দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রা (দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি)	সম্ভবত অস্বীকার করবে না; (বলবে) এসব বৈশ্বিক বিষয়, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বড় কারণ; ভর্তুকি দিয়ে খোলাবাজারে কম দামে খাদ্যপণ্য বিক্রি; অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় মূল্যস্ফীতি কম (সামনে আরো কমবে); বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে দ্রব্যমূল্য সিন্ডিকেট	**[সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে]** (বলবে) মূল্যস্ফীতির সরকারি পরিসংখ্যান ভ্রান্ত; মূল্যস্ফীতি ৩০ শতাশ; সরকার সৃষ্ট সিন্ডিকেটই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ, এসব সিন্ডিকেট জিনিসের দাম বাড়িয়ে লুট করছে আর লুটের টাকা পাচার	দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাব ফেলবে—প্রভাব থাকবে—**বিএনপির পক্ষে**। (স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ—প্রভাব থাকবে **আওয়ামী লীগের পক্ষে**। কোনো কারণে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করে তা মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে আনতে পারলে

সারণি ৩... চলমান

		করছে; সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা অযোগ্য-অদক্ষ-দুর্নীতিবাজ-দলীয় (সরকার পরিবর্তনই একমাত্র সমাধান)	এ প্রভাব সমীকরণ পাল্টে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কিছু প্রভাব থাকবে আওয়ামী লীগের পক্ষে)
৬। মানব নিরাপত্তা: আইনশৃঙ্খলা, মানবাধিকার, (সরকারি) শাসন সংস্কৃতি	"পরিস্থিতি ভালো" দেখাতে যা বলার সবকিছু বলবে; বিচার বিভাগ স্বাধীন—এতে সরকারের হাত নেই; যতটুকু "মন্দ" তা বিএনপি-জামায়াতের কারণে; যুদ্ধাপরাধীসহ সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের বিচার ও বিচারে বাধা; বিএনপি-জামায়াতের অগ্নিসন্ত্রাসসহ অগণতন্ত্রী ও সন্ত্রাসী আচরণ	— (অবস্থান হবে) চরম সমালোচনামূলক-আক্রমণাত্মক। (বলবে) গুম-খুন-মামলা, বিনা বিচারে কারাগার; ভয়াবহ-দানবীয়-ফ্যাসিস্ট সরকার; রাজনৈতিক প্রতিহিংসা; প্রশাসন-বিচারব্যবস্থার দলীয়করণ; এসব কারণে মার্কিন স্যাংশন; রাষ্ট্র মেরামত	দোদুল্যমান ভোটারদের ভোটপ্রদান সিদ্ধান্তে মানব নিরাপত্তার দুটো দিক (ব্যক্তিগত-পারিবারিক নিরাপত্তা এবং আয়-উপার্জনগত নিরাপত্তা) বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে। প্রভাবের গতিমুখ হবে **বিএনপির পক্ষে**
৭। প্রযুক্তিকেন্দ্রিক	(বলবে) প্রযুক্তি সহজলভ্য করা হয়েছে, ডিজিটাল বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ। বিএনপির আমলে প্রযুক্তি নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা করা হয়েছে	(বলবে) আওয়ামী লীগ সরকারের অনুগতরা প্রযুক্তি ব্যবসা করেছে; ডিজিটাল ডিভাইড ও বৈষম্য, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে পারে	দোদুল্যমান ভোটারদের ভোটপ্রদান সিদ্ধান্তে খুব কমই প্রভাব ফেলবে—স্বল্পমাত্রার প্রভাবের গতিমুখ হবে **আওয়ামী লীগের পক্ষে**

সারণি ৩... চলমান

৮।	২০১৪ ও ২০১৮-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন	(বলবে) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ গণতন্ত্র সমুন্নত করার প্রধান দায়িত্ব; সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা; একবার নির্বাচনে না এসে আরেকবার নির্বাচনে এসে বর্জন করা—এসব অগণতান্ত্রিক; নির্বাচনে ভোটার অংশগ্রহণ করেছে; নির্বাচনে কোনো ভোট কারচুপি হয়নি; বিএনপি ভুয়া ভোটার করেছিল	(বলবে) ২০১৮-তে কোনো ভোটার ভোট দেননি; ভোটারবিহীন নির্বাচন, পুরো নির্বাচন ছিল "ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং"; প্রশাসন-পুলিশ নির্বাচন করে দিয়েছে; গণতন্ত্র হত্যা করা হয়েছে—(বলবে) এসব ফ্যাসিবাদের লক্ষণ	দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে বেশ প্রভাব ফেলবে। যেসব ভোটার ভোট দিতে পারেননি—(বিশেষ করে প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার ভোটারদের ক্ষেত্রে)—তাদের ক্ষেত্রে অনেক প্রভাব থাকতে পারে। প্রভাবের গতিমুখ হবে **বিএনপির পক্ষে**
৯।	স্যাংশন (মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা) (ইসরায়েলের প্যালেস্টাইন আক্রমণ-প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ: 'স্যাংশন' কৌশলের অংশ হতেও পারে, নাও পারে)	স্যাংশনকে সুযোগ হিসেবে নিয়ে এ বিষয়ে জাতীয় একাত্মবোধ-জাতীয় জাগরণ সৃষ্টির কৌশল। এক্ষেত্রে **১৯৭১**-এর মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কখন-কেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তা তুলে ধরবে। জনগণের ওপর মার্কিন স্যাংশনের সম্ভাব্য সবধরনের নেতিবাচক প্রভাব এবং তা	পুরো দায়ী করবে আওয়ামী লীগ সরকারকে। (বলবে) সুষ্ঠু নির্বাচন না করে ভোটারবিহীন নির্বাচন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, প্রশাসন-বিচার দলীয়করণ, সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্র—এসবই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশন দেওয়ার মূল কারণ।	দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে যথেষ্টমাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে। স্যাংশনকে সুযোগ হিসেবে দেখে জাতীয় একাত্মতা-জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করতে পারলে বিষয়টি যথেষ্টমাত্রায় **আওয়ামী লীগের পক্ষে যেতে পারে** (এ সম্ভাবনা অমূলক নাও হতে পারে)

সারণি ৩... চলমান

	মোকাবিলার পথ নিয়ে বলবে। (বলবে) ইরান-ইরাকে মার্কিন স্যাংশনের কথা, বাদ পড়বে না লিবিয়া-আফগানিস্তান-প্যালেস্টাইন। (কৌশলটি হবে একইসাথে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মীয় আবেগানুভূতি-ভিত্তিক)	বাঁচতে হলে সরকার পরিবর্তন জরুরি; বাঁচতে হলে রাষ্ট্র মেরামত জরুরি। স্যাংশন-কেন্দ্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য থাকবে না। ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের বিরুদ্ধে বলবে না।	

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স), ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার, আমদানি-রপ্তানি, জাতীয় বাজেট, মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), প্রবৃদ্ধি, খেলাপি ঋণ—**অর্থনীতির** বড় বড় এসব বিষয় নিয়ে দুই পক্ষই অনেক কিছু বলবে। জিডিপি, প্রবৃদ্ধি, বাজেট—এসব বিষয়ে আওয়ামী লীগ ছক এঁকে দেখাবে যে বিএনপির শাসনামলের তুলনায় তাদের আমলে অনেক বেশি উন্নতি হয়েছে। ২০০৬ সালকে ভিত্তিবছর ধরে সচিত্র উন্নতি**চিত্র** দেখাবে। আর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, প্রবাসী আয়, টাকার বিনিময় হার, আমদানি-রপ্তানি—এসবের নিম্নমুখী প্রবণতা স্বীকার করে আওয়ামী লীগ বলবে যে এ প্রবণতা বৈশ্বিক এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে অবস্থার অবনতি হয়েছে। তবে তথ্যপ্রমাণসহ আওয়ামী লীগ বলবে: "এত কিছুর পরেও আমাদের অবস্থা অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভালো এবং তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় আমাদের দক্ষতার পরিচয় বহন করে।" সুতরাং সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে আওয়ামী লীগের অবস্থান হবে একই সাথে আগ্রাসী এবং আত্মরক্ষামূলক। আর এর পাশাপাশি অর্থনীতির বড় বড় বিষয় নিয়ে বিএনপির অবস্থান হবে পুরোদস্তুর আক্রমণাত্মক-মারমুখী। বিএনপি—যেসব বিষয়ে সবচে বেশি আক্রমণাত্মক হবে, তা হলো—বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে আসা, প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) কমে আসা, ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পতন, খেলাপি (ব্যাংক) ঋণ বেড়ে যাওয়া, আমদানি-রপ্তানি পরিস্থিতির অবনতি। এসব বিষয়ে আক্রমণাত্মক বক্তব্য

দিয়ে বিএনপি বোঝাতে চাইবে যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়-তলানীতে এবং এ জন্য আওয়ামী লীগ সরকারই দায়ী; (বলবে) ভালো করতে হলে এই সরকার রাখা যাবে না। সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয়াদি নিয়ে বিএনপি-আওয়ামী লীগ যা বলবে, তার সত্যতা যা-ই হোক না কেন "দলীয় অনুগত ভোটার"দের (৩০ শতাংশ বিএনপি, ৩০ শতাংশ আওয়ামী লীগ, ১০ শতাংশ অন্যান্য দল) ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে এসবের কোনোই ভূমিকা থাকবে না। কারণ দলীয় অনুগত ভোটার, বিধায় তারা তো কোনো অবস্থাতেই তাদের স্ব-স্ব ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন না (তারা নির্দিষ্ট দলের প্রার্থীকেই ভোট দেবেন)। মূল প্রশ্নটা অন্যত্র। প্রশ্নটা হলো—সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি প্রবণতাসংশ্লিষ্ট এসব বক্তব্য সেইসব ভোটারের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তগ্রহণে কতটুকু প্রভাব রাখবে, যারা "দোদুল্যমান ভোটার" অর্থাৎ যারা "দলীয় অনুগত ভোটার নন", যারা "এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি যে দুই দলের মধ্যে কোন দলের প্রার্থীকে ভোট দেবেন"? সম্ভাবনাটা সম্ভবত এ রকম: সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয়াদি, এমনকি ব্যাংক ঋণ খেলাপি বেড়ে যাওয়া অথবা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ার মতো বিষয় যা মানুষ জানে এবং বিশ্বাস করে, তা ওইসব ভোটারের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে তেমন কোনো ভূমিকা রাখবে না (অথবা সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখবে না)। কারণ, ওইসব ভোটারের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে নিয়ামক ভূমিকা রাখার মতো অন্য আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ফ্যাক্টর আছে, যা তাদের জীবন-জীবিকার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত—যেমন দ্রব্যমূল্য, নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি। এখানে বলে রাখা দরকার যে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে আসা অথবা রেমিট্যান্স কমে আসা অথবা বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার দাম কমে আসা—এসবের সাথে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন এখন থেকে দুই বছর আগে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল প্রায় ৪৬ বিলিয়ন ডলার, যা এখন দ্বিগুণ কমে ২২-২৩ বিলিয়ন ডলারে ঠেকেছে। এর অর্থ কি এই যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দ্বিগুণ কমার কারণে দোদুল্যমান ভোটারদের মধ্যে সরকারের ভোট দ্বিগুণ কমে গিয়েছে? যদি তাই-ই হয়, সেক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার মূল্যমান কমলে তো সরকারদলীয় প্রার্থী এ কারণে দোদুল্যমান ভোটারদের বেশকিছু অতিরিক্ত ভোট পেয়ে যাবেন; কারণ এসব ভোটারদের প্রায় ২০ শতাংশ বিদেশ থেকে তাদের অভিভাবক-সন্তানাদিদের প্রেরিত রেমিট্যান্স ভোগ করেন (যেখানে আগের সমান বৈদেশিক মুদ্রায় এখন আগের চেয়ে কমপক্ষে ২০ শতাংশ বেশি বাংলাদেশি টাকা পাওয়া যায়)।

"ঘুষ-দুর্নীতি-কালোটাকা-অর্থপাচার" সম্ভবত আমাদের দেশে সবচে বেশি আলোচিত বিষয় এবং তা নতুন নয়। আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-বিএনপি

উভয় পক্ষ এ বিষয়ে বিভিন্নমুখী আক্রমণাত্মক বক্তব্য হাজির করবেন। উভয় পক্ষ একে অন্যকে সীমাহীন দুর্নীতিবাজ প্রমাণে সচেষ্ট হবেন। আওয়ামী লীগ বলবে, বিএনপির শাসনামলে বাংলাদেশ ছিল দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন—একাধিকবার; খুঁটি-খাম্বা, হাওয়া ভবন, মোবাইল ফোনের একচেটিয়া ব্যবসা, দ্রব্যমূল্য সিন্ডিকেট—এসব উদাহরণ দেওয়া হবে। আর বিএনপি বলবে "ঘুষ-দুর্নীতি-লুট-অর্থপাচার-কালোটাকা" আওয়ামী লীগের শাসনামলে সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে; তারা সুইস ব্যাংকসহ অন্যান্য উৎস উদ্ধৃত করে আওয়ামী লীগের শাসনামলে ঘুষ-দুর্নীতি-কালোটাকা-অর্থপাচারের হিসেবপত্তর দিতে পারে। দোদুল্যমান ভোটাররা ঘুষ-দুর্নীতি-কালোটাকা-অর্থপাচারসংশ্লিষ্ট দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে কাকে ভোট দেবেন? তারা কি তাকে ভোট দেবেন, যিনি কম দুর্নীতিবাজ? সম্ভবত এসব হবে না। কারণ বাস্তবতা হলো এই যে দোদুল্যমান ভোটার দুই দলের প্রার্থীর মধ্যে ফেরেশতা খোঁজেন না; তিনি খোঁজেন এমন একজনকে, যাকে তিনি তার নিজের বা তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তাহীনতার কারণ বলে মনে করেন না অথবা বিপদে-আপদে যার কাছে যেতে পারবেন (অথবা যেতে পারেন বলে মনে করেন) অথবা মনে করেন যে তাকে ভোট দিলে আমার রুটিরুজির অবস্থা খারাপ হবে না অথবা আরও খারাপ হবে না, অথবা একটু ভালো হলেও হতে পারে। এইসব ভোটার খুব ভালোভাবেই জানেন যে, প্রার্থীরা নির্বাচন উপলক্ষে অনেক অর্থ ব্যয় করেন। ভোটাররা সম্ভবত এটাও মনে করেন যে প্রার্থীরা ভোটকে কেন্দ্র করে (মনোনয়ন পাওয়া থেকে শুরু করে) যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেন, তা "ব্যয় নয় বিনিয়োগ"; আর বিনিয়োগকৃত অর্থ তুলে আনা অথবা সুদে আসলে উসুল করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমনটা কি অস্বাভাবিক-অবাস্তব যে একজন ভোটার দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে এমন একজনকে ভোট দিতে মনস্থির করলেন, যিনি "তার জন্য তুলনামূলক কম ক্ষতিকর, কিন্তু অন্য প্রার্থীর তুলনায় (তার জানামতে) অনেক বেশি দুর্নীতিবাজ-অসৎ"? এমনটাও তো খুব অবাস্তব নয়, যখন দেখা যায় যে বেশির ভাগ আসনে অতি সৎ ব্যক্তি অতি কম ভোট পান। সুতরাং শেষ বিচারে প্রার্থীর 'দুর্নীতি' সংশ্লিষ্টতার সাথে ভোটারের (দোদুল্যমান ভোটার অথবা দলীয়-অনুগত ভোটার যেই-ই হোক না কেন) ভোট প্রদান সিদ্ধান্তের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই।

"দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি"—সম্ভবত এ মুহূর্তে জনজীবনের কষ্ট-দুর্দশার সবচে বড় কারণ। "দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি" এখন এমন রূপ নিয়েছে যে দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত -মধ্যমধ্যবিত্তনির্বিশেষে সবাই-ই পরিবার পরিচালনে অতিমাত্রায় পর্যুদস্ত। এরাই কিন্তু ৯৫ শতাংশ ভোটার। এদের অনেকেই "নতুন-দরিদ্র" (New Poor)। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসহ (চাল, আটা, ডাল, সয়াবিন তেল, আলু, শাকসবজি, মাছ, মাংস, ডিম)

খাদ্যবহির্ভূত (বাসা ভাড়া, বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানি, ওষুধপত্তর, শিক্ষা, যানবাহন-যাতায়াত) সবকিছুর দাম উচ্চ হারে বেড়েছে; কিন্তু মানুষের আয় বাড়েনি। এসবই শহর-গ্রামনির্বিশেষে সব বয়সের সব ভোটারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। "দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি"র কারণে ভোটারের মন খুবই খারাপ, খুবই ভারাক্রান্ত; তাদের মনে জমেছে গভীর ক্ষোভ, রাগ, হতাশা, অবিশ্বাস, অনাস্থা। বিষয়টি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সম্ভবত অস্বীকার করবে না। তবে কিছুটা আত্মরক্ষামূলক কৌশল নিয়ে বলবে যে, বিষয়টি বিশ্বব্যাপী ঘটছে আর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এসবে প্রভাবকের কাজ করছে; (বলবে) অনেক টাকা ভর্তুকি দিয়ে সরকার স্বল্পমূল্যে খোলাবাজারে খাদ্যপণ্য বিক্রি করছে; একই সাথে বলবে যে, অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের মূল্যস্ফীতি কম (সামনে আরো কমবে); এমন কথাও বলবে (বলতে পারে) যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী সিন্ডিকেট আসলে বিরোধীদেরই সৃষ্টি এবং তা চক্রান্তমূলক-ষড়যন্ত্রমূলক। আর এসবের বিপরীতে বিএনপির জন্য "দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি"—বিষয়টি হতে পারে তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী-কৌশল। এ নিয়ে বিএনপির কৌশল হবে পুরোপুরি আক্রমণাত্মক; এ নিয়ে তারা একচুলও ছাড় দেবে না। বিএনপি বলবে যে, মূল্যস্ফীতি আসলে ১০ শতাংশ নয় তা হবে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ; বলবে এসবই সিন্ডিকেটের কাজ, যারা সরকারসৃষ্ট "আওয়ামী লীগের সিন্ডিকেট"; (বলবে) এরা দাম বাড়িয়ে জনগণের পকেট কাটছে আর লুটের টাকা বিদেশে পাচার করছে (তারা পাচারের হিসেবপত্তর দিয়ে দেবে); (বলবে) দ্রব্যমূল্যসহ মানুষের জীবন-জীবিকাসংশ্লিষ্ট সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ—সরকার ব্যর্থ; (বলবে) সরকারের পরিবর্তনই হতে পারে এসব সমস্যার একমাত্র সমাধান; আর এসবের সাথে যুক্ত করবে মার্কিন স্যাংশন এবং রাষ্ট্র মেরামত সংস্কার বিষয়াদি। জনগণ যেহেতু দৈনন্দিন জীবন-জীবিকায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির শিকার-ভুক্তভোগী, সেহেতু তাদের এসব বিশ্বাস না করার কোনো কারণ নেই। সম্ভবত দ্রবমূল্যের ঊর্ধ্বগতিসংশ্লিষ্ট বিষয়ই হবে এবারের (আসন্ন) নির্বাচনে দোদুল্যমান ভোটারদের (যারা "দলীয় অনুগত ভোটার নন" অর্থাৎ " যেসব ভোটার তাদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্ত করেননি") ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত প্রভাবান্বিত করতে মূল ফ্যাক্টর অথবা সবচে শক্তিশালী ফ্যাক্টর (নিয়ামক ফ্যাক্টর)। এ মুহূর্তে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি যা, তাই-ই যদি থাকে সেক্ষেত্রে দোদুল্যমান ভোটাররা বিএনপির দিকে ঝুঁকবে। তবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিসংশ্লিষ্ট বিএনপিপক্ষীয় এ প্রভাব শর্তহীন বা নিরঙ্কুশ নাও হতে পারে। যেমন যেসব দরিদ্র-বিত্তহীন-স্বল্পআয়ী মানুষ সরকারের পরিচালিত খোলাবাজারে খুচরা বাজারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে চাল-আটা-সয়াবিন তেল-চিনি পেয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা দোদুল্যমান ভোটার (দলীয় অনুগত নন) তারা কিন্তু এ সুবিধা-প্রত্যাশা অব্যাহত রাখতে তাদের

ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে বিষয়টি নিয়ে ভাববেন। আবার সামনের কয়েক মাসে—নির্বাচনের আগে দ্রব্যমূল্য যদি দৃশ্যমান কমে (ধরুন চালের কেজি যদি ৬০ টাকা থেকে কমে ৪০ টাকা হয়) এবং ভোটাররা যদি বিশ্বাস করেন যে ভোটের পরে তা আবার বাড়বে না, তাহলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিসংশ্লিষ্ট ভোটারদের মন পরিবর্তন অসম্ভব নাও হতে পারে। আর সেক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যনির্ভর ভোটের এই মুহূর্তের হিসেবপত্তর কিছুটা পাল্টে যেতে পারে। এসব সম্ভাবনা কম হলেও হতে পারে, তবে তা অসম্ভব নয়। দোদুল্যমান ভোটাররা কিন্তু তাদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

"আইনশৃঙ্খলা, মানবাধিকার পরিস্থিতি, শাসন সংস্কৃতি"—মানব নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট এসব বিষয় দিয়ে মানুষের জীবন-জীবিকার অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়। এসবের উন্নতি হলে মানুষ হয়তো কিছু বলে না, তবে অবনতি হলে এবং তিনি বা তার পরিবার-পরিজনসহ ঘনিষ্টজনদের কেউ এসবের শিকার হলে বা ভুক্তভোগী হলে—তারা মুখে না বললেও ভোটে বলেন। সরকার আর বিরোধীদল উভয়েই এসব খুব ভালো জানে। সে কারণেই "আইনশৃঙ্খলা, মানবাধিকার, শাসন সংস্কৃতি" নিয়ে সরকারি দল (আওয়ামী লীগ) অবশ্যই বলবে যে "পরিস্থিতি খুব ভালো—"অতীতের তুলনায় অনেক ভালো", আর একই সাথে বলবে যে যতটুকু "খারাপ বা মন্দ" তার জন্য বিরোধীদের সন্ত্রাসী আচরণ এবং কথায় কথায় বিদেশিদের কাছে ধরণা দেওয়া—এসবই দায়ী। সরকারি দল মনে করিয়ে দেবে, বিএনপি-জামায়াতের অগ্নিসন্ত্রাসসহ সবধরনের সন্ত্রাসী আচরণ। এও বলবে, "ওরা ক্ষমতায় এলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করবে, আর আমরা করব উন্নয়ন"। স্বাধীনতাবিরোধীদের কর্মকাণ্ড, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র, দেশে জঙ্গি-সন্ত্রাসীদের অতীত কর্মকাণ্ড, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা—সম্ভবত এসবই সরকারি দলের বক্তব্যে গুরুত্ব পাবে। "আইনশৃঙ্খলা, মানবাধিকার, শাসন সংস্কৃতি" এসব বিষয়ে বিএনপির বক্তব্য-অবস্থান হবে চরম সমালোচনামূলক-আক্রমণাত্মক-আগ্রাসী। তারা যেসব বিষয় সামনে আনবে, তার মধ্যে থাকবে নেতাকর্মীদের ওপর মামলা (৮৫ লক্ষ মামলার কথা বলবে), হামলা, বিনা বিচারে কারাগার, গুম-খুন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, প্রশাসন দলীয়করণ, আইনশৃঙ্খলাব্যবস্থার দলীয়করণ, বিচারব্যবস্থার দলীয়করণ, ফ্যাসিস্ট সরকার—আর এসব কারণেই মার্কিনী স্যাংশন (নিষেধাজ্ঞা) এবং রাষ্ট্র মেরামত সংস্কার প্রস্তাব। দুই পক্ষের কথাবার্তা ভোটাররা শুনবেন, গ্রহণ-বর্জন হবে ভোটার যা জানে এবং বিশ্বাস করে, তা দিয়ে। এসব বক্তব্যে কোনো দলেরই দলীয় অনুগত ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে না। তবে দোদুল্যমান ভোটারদের মনে মানব নিরাপত্তার দুটো দিক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে: (১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (নিজের ও পরিবারের সদস্যদের), (২) আয়-উপার্জনগত

নিরাপত্তা। দোদুল্যমান ভোটারের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানব নিরাপত্তার এই দুই বিষয় প্রভাব ফেলবে। উদ্দিষ্ট ভোটারদের মনে মানব নিরাপত্তাকেন্দ্রিক এই প্রভাবের সম্ভাব্য গতিমুখ হতে পারে বিএনপির পক্ষে। তবে বিএনপিমুখী এ প্রবণতা নিরঙ্কুশ হবে না। কারণ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচির মাধ্যমে যেসব মানুষ (নারী, পুরুষ, প্রবীণ, ছাত্রছাত্রী, প্রতিবন্ধী) বিভিন্ন ধরনের ভাতা ভোগ করেন, তাদের মধ্যে দোদুল্যমান ভোটার যারা দলীয় অনুগত ভোটার নন, তাদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে এসবই কিছুটা কাজ করবে। কারণ সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট এসব কর্মকাণ্ড সঙ্গত কারণেই মানুষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

আসন্ন নির্বাচনে **প্রযুক্তি**কেন্দ্রিক বিষয়াদি নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা অনেক কথা বলবেন। কারণ এ নিয়ে তাদের অনেক বলার আছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলা হবে। বলা হবে প্রযুক্তি সহজলভ্য করার কথা আর একই সাথে বলা হবে বিএনপির শাসনামলে প্রযুক্তি নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসার কথা। আর বিএনপি বলবে, আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে তাদের দলীয় অনুগত ব্যক্তিরা প্রযুক্তি নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে; বলবে, ডিজিটাল-বিভাজন ও ডিজিটাল বৈষম্যের কথা; বলবে, প্রযুক্তিনির্ভর বড় বড় প্রকল্পে দুর্নীতির কথা। প্রযুক্তিকেন্দ্রিক এসব কথাবার্তা দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে কিছু প্রভাব ফেললেও ফেলতে পারে। তবে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এসবের প্রভাব হবে খুবই কম। প্রভাবের গতিমুখ হবে আওয়ামী লীগের পক্ষে।

"২০১৪ ও ২০১৮-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন"—বিষয়টি আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি তাদের অন্যতম ভোটকৌশল হিসেবে বিবেচনা করবে। আওয়ামী লীগ বলবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং গণতন্ত্র সমুন্নত রাখার জন্য অবশ্য করণীয়—আমরা সেটাই করেছি। (বলবে) উভয় নির্বাচনেই বিএনপি ফেইল করেছে—২০১৪ সালে নির্বাচনে অংশ না নিয়ে, আর ২০১৮ সালে বর্জন করে। আওয়ামী লীগ আরো যা বলবে, তার মধ্যে থাকবে—নির্বাচনে যথেষ্ট পরিমাণ ভোটারের উপস্থিতি ও ভোট প্রদান, কোনো কারচুপি না হওয়া, বিএনপির ভুয়া ভোটার বানানো। এসবের বিপরীতে ২০১৪ ও ২০১৮-এর নির্বাচন নিয়ে (বিশেষ করে ২০১৮ নির্বাচন নিয়ে) পুরোপুরি আক্রমণাত্মক অবস্থান থেকে বিএনপি বলবে— নির্বাচন বলে কোনো কিছু হয়নি, হয়েছে ভোটারবিহীন "ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং"—মানুষ তার পবিত্র ভোট দিতে পারেননি, নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী গণতন্ত্র হত্যা করেছে। বিএনপি এও বলবে যে, দেখুন "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যে স্যাংশন (ভিসা নিষেধাজ্ঞা) দিয়েছে-দিচ্ছে তার প্রধান কারণই হলো অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ,

অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন না হওয়া"। ২০১৮-এর নির্বাচন বিষয়টি দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলবে। এসব প্রভাব বেশি পড়তে পারে সেইসব দোদুল্যমান ভোটারের মধ্যে, যারা ভোট দিতে পারেননি অথবা যাদের ভোট প্রদান অভিজ্ঞতা ভালো নয়। এই প্রভাবের গতিমুখ হবে বিএনপির পক্ষে।

"স্যাংশন" (নিষেধাজ্ঞা, মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা, একই সাথে আন্তর্জাতিক বিষয় হিসেবে প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ ঘোষণা) আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এবং অপ্রিয় বিষয়। "মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা" বিষয়টি হাজির করে বিএনপি চাইবে আওয়ামী লীগ সরকারকে হোয়াইট ওয়াশ করতে। বিএনপি বলবে—২০১৮ সালের ভোটারবিহীন নির্বাচন, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চরম অনিহা ও ব্যর্থতা, আইনশৃঙ্খলা-প্রশাসন-বিচার বিভাগে দলীয়করণ, সীমাহীন দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্র—এসবই আমাদের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মূল কারণ। সুতরাং এই সরকার ব্যর্থ, তাকে চলে যেতে হবে (তার অধীনে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অবাধ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্ভব নয়)। এর বিপরীতে 'স্যাংশন' বিষয়টি আওয়ামী লীগ সম্ভবত বড় সুযোগ (opportunity) হিসেবে দেখবে। মার্কিন সরকার নিয়ে আওয়ামী লীগ যা বলবে, তার মধ্যে থাকবে—১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্বাধীনতাবিরোধী অবস্থান, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ দখল/ইজারা নেওয়ার অশুভ পাঁয়তারা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বাধা দেওয়া, বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফেরত না দেওয়া, অর্থনীতি যখন উপরের দিকে যাচ্ছে তখনই কেন আক্রমণ, তেল-গ্যাসসম্পদ দখলের চেষ্টা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ, দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপ, ইরান-ইরাক স্যাংশন ইত্যাদি। আওয়ামী লীগের জন্য ইসরায়েলের প্যালেস্টাইন আক্রমণ-প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিষয়টি স্যাংশন-এর সহ-ইস্যু অথবা আলাদা ইস্যু হতে পারে। এ বিষয়ে বিএনপির ঘোষিত কৌশল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের পক্ষে হতে পারে। স্যাংশন বিষয়ে আওয়ামী লীগের মূল কৌশল হতে পারে এমন, যা জনগণের মধ্যে স্যাংশনবিরোধী জাতীয় একাত্মবোধ-জাতীয় সংহতি-জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করতে পারে। স্যাংশন নিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচন কৌশল হয়ে যেতে পারে একই সাথে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মীয় অনুভূতিযুক্ত (ইরান, ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইনের কথা বলা হবে)। আর তা যদি হয়, সেক্ষেত্রে "স্যাংশন" কৌশল এমন প্রভাবক হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে, যা আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করবে।

আসন্ন নির্বাচনে সরকারি দল আওয়ামী লীগ ও প্রধান বিরোধী দল বিএনপি—ভোটারদের মনে প্রবেশ করে তাদের ভোট পাবার জন্য কী কী বলবে—এ নিয়ে গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জরুরি। কারণ, আমরা ভোটারের

ভোটপ্রদান সিদ্ধান্তের মূল উপাদান অনুসন্ধান করছি। আমাদের শেষ লক্ষটা ছিল আসন্ন ২০২৪-এর ১২তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল কেমন হতে পারে—এ বিষয়ে জানার চেষ্টা করা অথবা যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণভিত্তিক সম্ভাবনাচিত্র উদ্‌ঘাটন করা। এসব প্রশ্নের সুনিশ্চিত কোনো উত্তর কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সম্ভাব্য উত্তর খুঁজতে আমরা এমন কিছু বেছে নিয়েছি, যেটিও জটিল। আর তা হলো 'ভোটারের মন' (voters mind)। নির্বাচন বা ভোট হলো মূর্ত (concrete) বিষয়, আর ভোটদাতার মন (mind) হলো সম্পূর্ণ বিমূর্ত (abstract) বিষয়। আমরা 'বিমূর্ত' বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে "মূর্ত" বিষয় অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। এসব যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত, যদি ভিত্তি অনুসিদ্ধান্ত মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত হয়।

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট পেতে প্রার্থীরা—দলনির্বিশেষে—মোট ৯ গুচ্ছ বিষয়ে বক্তব্য দেবেন। এসব বক্তব্যের অনেক কিছুই দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে তেমন কোনো ভূমিকা রাখবে না, আবার অনেক কিছুই বেশ ভূমিকা রাখবে। এ নিয়ে আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যথেষ্ট কার্যকর ইঙ্গিত দেয় যে আসন্ন নির্বাচনে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে সুনির্দিষ্ট ৫টি বিষয় বা অবজেক্টিভ ফ্যাক্টর ভূমিকা রাখবে বলে মনে হয়। এই ৫টি ফ্যাক্টর হলো—(১) **দ্রব্যমূল্য** (সুনির্দিষ্টভাবে বললে "দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি" ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি), (২) **মানব নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট** দুটি বিষয় (ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তা এবং আয়-উপার্জনগত নিরাপত্তা), (৩) **পদ্মা সেতু**, (৪) **২০১৮-এর নির্বাচন** এবং (৫) **"স্যাংশন"** (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দেওয়া নিষেধাজ্ঞা—ভিসা নিষেধাজ্ঞাসহ সম্ভাব্য অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা; একই সাথে আন্তর্জাতিক বিষয় হিসেবে প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ ঘোষণা)।

আমরা মনে করি, দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে উল্লিখিত ৫টি ফ্যাক্টর কাজ করবে। তবে প্রত্যেক ফ্যাক্টর-এর প্রভাবমাত্রা এবং প্রভাবের গতিমুখ একই রকম হবে না (সারণি ৪)। এখন অবস্থা যা, সেটা যদি অটুট থাকে বা অপরিবর্তিত থাকে—সেক্ষেত্রে এসব ফ্যাক্টরের মধ্যে ২টি ফ্যাক্টরের প্রভাব সুবিধা পাবে আওয়ামী লীগ (ফ্যাক্টর: "পদ্মা সেতু" এবং "স্যাংশন"); আর বাকি ৩টির সুবিধা পাবে বিএনপি (ফ্যাক্টর: "দ্রব্যমূল্য", "মানব নিরাপত্তা", "২০১৮ নির্বাচন")। তবে "দ্রব্যমূল্য" ও "মানব নিরাপত্তা"—এই দুই ফ্যাক্টরের কিছু কাউন্টার-ফ্যাক্টর আছে, যা বিভিন্ন মাত্রায় কাজ করতে পারে (এ বিষয়ে পরে আসছি)।

দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত গ্রহণে ৫টি ফ্যাক্টরের মধ্যে ৩টির সম্ভাব্য প্রভাবমাত্রা হতে পারে "অনেক বেশি"—"পদ্মা সেতু" (তবে প্রভাবটা হতে পারে ভৌগলিকভাবে সীমাবদ্ধ, দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৬৮টি আসনে),

"দ্রব্যমূল্য" এবং "স্যাংশন" (সারণি ৪)। এসব ফ্যাক্টরের মধ্যে দুটির—"পদ্মা সেতু" ও "স্যাংশন"-এর প্রভাব-গতিমুখ হবে আওয়ামী লীগের পক্ষে, আর একটির—"দ্রব্যমূল্য" গতিমুখ হবে বিএনপির পক্ষে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য নির্বাচনের মাসখানেক আগে ২০-২৫ শতাংশ কমলে ফ্যাক্টরটির প্রভাব-গতিমুখ নিরঙ্কুশ বিএনপিমুখী হবে না। আর সম্ভাব্য "মাঝারি প্রভাব" ফ্যাক্টর—"২০১৮-এর নির্বাচন" এবং "মানব নিরাপত্তা" ফ্যাক্টর দুটির প্রভাব-গতি হবে মূলত বিএনপিমুখী।

সারণি ৪: ২০২৪ নির্বাচনে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে যেসব ফ্যাক্টর প্রভাব ফেলবে: ফ্যাক্টরভিত্তিক প্রভাবমাত্রা এবং প্রভাবের গতিমুখ

দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত গ্রহণে যেসব ফ্যাক্টর (উপাদান) প্রভাব ফেলবে	ফ্যাক্টরের সম্ভাব্য প্রভাবমাত্রা (দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তের ওপর)	ফ্যাক্টরের প্রভাবের গতিমুখ: কোন দলের পক্ষে
১। দ্রব্যমূল্য (দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি)	অনেক [অনেক ভোটারের মনে এ ফ্যাক্টরটি তাদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে প্রধান বিচার্য হতে পারে]	এখন অবস্থা যা, তাতে ফ্যাক্টরটির স্বাভাবিক প্রভাব-সুবিধা হবে বিএনপিমুখী। তবে সরকার খোলাবাজারে স্বল্পমূল্যে চাল-আটা-তেল সরবরাহের যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তার কিছু প্রভাব-সুবিধা থাকবে আওয়ামী লীগের পক্ষে। আর সেই সাথে যদি নির্বাচনের আগে নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটি ভোগ্যপণ্যের (চাল, আটা, সয়াবিন তেল, চিনি) মূল্য ২০-২৫ শতাংশ কমে তার কিছু প্রভাব- সুবিধা পাবে আওয়ামী লীগ

সারণি ৪... চলমান

২। মানব নিরাপত্তা (ব্যক্তিগত-পারিবারিক, আয়-উপার্জনগত)	মাঝারি [কোন কোন ভোটারের ক্ষেত্রে প্রধান ফ্যাক্টরও হতে পারে]	প্রভাবের গতিমুখ প্রধানত বিএনপির পক্ষে। তবে তা নিরঙ্কুশ নয়। মানব নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের ভাতা কার্যক্রমের সুবিধা পেতে পারে আওয়ামী লীগ
৩। পদ্মা সেতু	অনেক (তবে ভৌগলিকভাবে সীমাবদ্ধ)	দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৬৮টি আসনের মধ্যে ২৩টি "বিজয়-অনিশ্চিত আসনে" ফ্যাক্টরটির সম্ভাব্য প্রভাব-সুবিধার পুরোটাই আওয়ামী লীগের পক্ষে
৪। ২০১৮ নির্বাচন	মাঝারি	প্রভাব সুবিধা পাবে বিএনপি
৫। স্যাংশন (নিষেধাজ্ঞা) (প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ ঘোষণা স্যাংশন ইস্যুর অংশ হতেও পারে, নাও পারে)	অনেক	(নির্বাচন) জাতীয় ঐক্য-জাতীয় সংহতির ইস্যু হিসেবে উত্থাপন করতে পারলে এ ফ্যাক্টরটির সুবিধা পাবে আওয়ামী লীগ

এটা খুবই বাস্তবসম্মত যে একজন দোদুল্যমান ভোটার তার ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণে ইচ্ছানিরপেক্ষ ফ্যাক্টর/শর্ত (objective factor/condition) এবং ইচ্ছাধীন ফ্যাক্টর/শর্ত (subjective factor/condition) উভয়ই বিবেচনা করেন। ওইসব শর্তের (ফ্যাক্টরের) অনুপাতিক প্রভাবমাত্রা বিভিন্ন দোদুল্যমান ভোটারের কাছে ভিন্ন ভিন্ন হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা উপরে যে পাঁচটি ফ্যাক্টরের কথা উল্লেখ করেছি—দ্রব্যমূল্য, মানব নিরাপত্তা, পদ্মা সেতু, ২০১৮ নির্বাচন, স্যাংশন (প্যালেস্টাইন যুদ্ধ ইস্যুসহ)—সবগুলোই অবজেকটিভ ফ্যাক্টর/শর্ত। দোদুল্যমান ভোটারের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত গ্রহণে এসব অবজেকটিভ শর্তের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু তা নির্ধারক নাও হতে পারে। ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত

চূড়ান্তকরণে ক্ষেত্রবিশেষে অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যেতে পারে সাবজেকটিভ ফ্যাক্টর/শর্তাদি। কেন-কীভাবে? যেকোনো আসনে দোদুল্যমান ভোটার কিন্তু বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মানুষ নন, তারা সমাজবদ্ধ মানুষ। এমন কোনো আসন পাওয়া যাবে না, যেখানে কোনো একটি পাড়া বা মহল্লার সব ভোটারই দোদুল্যমান ভোটার। এটা হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। বাস্তব অবস্থাটা হবে এ রকম: একটি গড় আসনে ৭০ শতাংশ ভোটার হলেন দলীয় অনুগত ভোটার (যে দলেরই হোক না কেন), আর বাকি ৩০ শতাংশ দোদুল্যমান। সম্ভবত এমন বাড়িও হয়তো পাওয়া যাবে না, যেখানে তিন-চারজন ভোটারের সবাই দোদুল্যমান ভোটার। দোদুল্যমান ভোটার ও দলীয় অনুগত ভোটার সম্ভবত একই বাড়িতে বাস করেন অথবা প্রতিবেশী। প্রতি একজন দোদুল্যমান ভোটারের পাশের দুজন দলীয় অনুগত ভোটার (আওয়ামী লীগ অথবা বিএনপি যে দলেরই হোক না কেন)। দলীয় অনুগত ভোটাররা নির্বাচন-ভোট নিয়ে যথেষ্ট মাত্রায় আগ্রহী বিধায় তারা তাদের নিত্যদিনের আলাপ-আলোচনায় নিজ দলের পক্ষে কথাবার্তা বলেন। দোদুল্যমান ভোটারদের ওপর এসবের প্রভাব পড়ে। এ প্রভাবের ফলেও দোদুল্যমান ভোটারের দোলাদুলি কমতে পারে। এসব প্রভাবের চূড়ান্ত ফল এমন দাঁড়ানো অস্বাভাবিক নয় যে ওই আসনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভিত্তি ভোট যে অনুপাতে বিভক্ত, দোদুল্যমান ভোটাররা শেষপর্যন্ত একই অনুপাতে ভাগ হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়াও আরও একটা সাবজেকটিভ ফ্যাক্টর আছে, যা দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণে অনেক কাজ করে—অন্তত আমাদের দেশে। এসব সাবজেকটিভ ফ্যাক্টর, যার প্রভাবে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণে অনেক ক্ষেত্রেই অবজেকটিভ ফ্যাক্টরের তুলনামূলক গুরুত্ব কমে যেতে পারে তা হলো আত্মীয়তা, বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্টজন, মুরুব্বিদের উপদেশ-আদেশ-নির্দেশ, পিতৃতান্ত্রিকতা (নারীর ক্ষেত্রে)। তবে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণে এসব সাবজেকটিভ ফ্যাক্টরের হুবহু প্রভাব কতটুকু তা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। মূল কথা হলো—দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ উভয় ফ্যাক্টরই কাজ করে।

দেশে মোট ৩০০টি সংসদীয় আসন। আমাদের হিসেবে এই ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৫টি আসন হলো "ভিত্তি আসন" (সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন) আর বাকি ১৪৫টি আসন হলো "বিজয়-অনিশ্চিত আসন"। এইসব বিজয়-অনিশ্চিত আসনে চূড়ান্ত বিজয় নির্ভর করবে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোটের ওপর। এসব আসনের যেকোনোটিতে আওয়ামী লীগ অথবা বিএনপি প্রার্থী জিততে পারে—যদি প্রার্থী ৪৬ শতাংশ ভোট পায়, যেখানে ৩০ শতাংশ দলীয় ভোট (যাকে বলছি "ভিত্তি ভোট") আর বাকি ১৬ শতাংশ "দোদুল্যমান ভোট"।

"বিজয়-অনিশ্চিত" ১৪৫টি আসনকে আমরা যৌক্তিক কারণে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি (যেটা আমরা সারাদেশের ৩০০ আসনের ক্ষেত্রেও করেছি)। **প্রথম ভাগে** আছে **পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক ৬৮টি আসন** (দেশের দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের ১৯ জেলায়)। বিভাজনটি এ জন্য করা হয়েছে যে "পদ্মা সেতুর ভোট লভ্যাংশ" (Padma Bridge Dividend Vote) বলে এমন কিছু আছে, যা এবারের ভোটে সংশ্লিষ্ট এলাকার দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে ভূমিকা রাখবে। **দ্বিতীয় ভাগে** আছে পদ্মা সেতুর প্রত্যক্ষ সুবিধা যারা পাচ্ছেন না, সেইসব এলাকা—ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলের **২৩২টি আসন** (দেশের ৪৯ জেলায়)। আমাদের হিসাবে মোট ১৪৫টি "বিজয়-অনিশ্চিত" আসনের মধ্যে ২৩টি আসন আছে পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক অঞ্চলে (১৯ জেলায়); আর ১২২টি আসন আছে ওই অঞ্চলের বাইরে ঢাকাসহ পূর্ব-পশ্চিম-উত্তরাঞ্চলে (৪৯ জেলায়) (সারণি ৫)। এখন প্রশ্ন—ভৌগলিকভাবে বিভাজিত উল্লিখিত দুই ধরনের "বিজয়-অনিশ্চিত আসনে" দোদুল্যমান ভোটাররা কী দেখে ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত নেবেন, তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী হবে এবং চূড়ান্ত সম্ভাব্য আসন বিভাজন কেমন হতে পারে?

পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক অঞ্চলের (দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল) বিজয়-অনিশ্চিত ২৩টি আসনে দোদুল্যমান ভোটাররা শেষপর্যন্ত কোন দিকে যাবেন? এই ২৩টি আসনে মোট ভোটার ৯২ লক্ষ, যাদের মধ্যে দোদুল্যমান ভোটার ২৭ লক্ষ ৬০ হাজার। আসনপ্রতি গড় ভোটার হবে ৪ লক্ষ, যাদের মধ্যে দোদুল্যমান ভোটার ১ লক্ষ ২০ হাজার। প্রতিটি আসনে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত গ্রহণে ৫টি ফ্যাক্টর প্রতিযোগিতা করবে: একদিকে থাকবে পদ্মা সেতু ফ্যাক্টর (যার প্রভাব আওয়ামী লীগমুখী) আর অন্য দিকে থাকবে "দ্রব্যমূল্য", "২০১৮ এর নির্বাচন", "মানব নিরাপত্তা" (যার প্রভাব হবে প্রধানত বিএনপিমুখী)। এখন প্রতিটি দোদুল্যমান ভোটারের কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় যে, শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু করেছেন (ফলে আপনাদের কী লাভ-ক্ষতি হয়েছে, তা আপনারাই ভালো জানেন); আর অন্যদিকে শেখ হাসিনার শাসনামলে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, "২০১৮-এর নির্বাচন" কেমন হয়েছে—তা আপনারা সবচেয়ে ভালো জানেন, "মানব নিরাপত্তার" সাথে সম্পর্কিত আইনশৃঙ্খলা-বিচার এবং বিভিন্ন ধরনের ভাতা কার্যক্রম এসব আপনারা জানেন—সবকিছু বিচার করে আপনার ভোটটা আপনি কোন দিকে দেবেন? এখানে মনে রাখা দরকার যে, দোদুল্যমান ভোটার কিন্তু কোনো দলের দলীয় অনুগত ভোটার নন। এসব নিয়ে পদ্মা সেতু অঞ্চলে "বিজয়-অনিশ্চিত আসন" এলাকায় মানুষের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, দোদুল্যমান ভোটারদের প্রতি ১০ জনের ৬ জন (৬০ শতাংশ) পদ্মা সেতুর কারণে শেখ হাসিনাকে ভোট দেবেন—অর্থাৎ ভোটটি পড়বে শেখ হাসিনার

নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের পক্ষে (প্রার্থী যে-ই হোক না কেন; আসলে ভোটটা পাবেন শেখ হাসিনা)। আর তা যদি হয়, সেক্ষেত্রে এই অঞ্চলের দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে যত ফ্যাক্টরই প্রভাব ফেলুক না কেন, অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ামক ফ্যাক্টর হবে "পদ্মা সেতু"। বিজয়-অনিশ্চিত আসনে জিততে হলে পেতে হবে দোদুল্যমান ভোটারদের ৫৬ শতাংশ ভোট, কিন্তু পাওয়ার সম্ভাবনা ৬০ শতাংশ ভোট। এসব বিচারে "পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক অঞ্চলে" ২৩টি বিজয়-অনিশ্চিত আসনের ২৩টিই পেতে পারে আওয়ামী লীগ (সারণি ৫)। আর তাই-ই যদি হয়, সেক্ষেত্রে পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক অঞ্চলের ৬৮টি আসনের চূড়ান্ত আসন বণ্টন অবস্থা দাঁড়াতে পারে এ রকম: আওয়ামী লীগ ৪৮টি আসন (২৫টি ভিত্তি আসন আর ২৩টি পদ্মা সেতুর লভ্যাংশ আসন), বিএনপি ১৬টি আসন (সবগুলো ভিত্তি আসন), আর ৪টি অন্যান্য দলের আসন (সবগুলো "ভিত্তি আসন") (সারণি ৬)। পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক অঞ্চলের ৬৮টি আসন নিয়ে আমাদের চূড়ান্ত সম্ভাব্য হিসেবপত্তর কিছুটা রক্ষণশীলও হতে পারে। কারণ "পদ্মা সেতু অঞ্চলে" যে ১৬টি আসনকে বিএনপির "ভিত্তি আসন" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা পদ্মা সেতু চালু হওয়ার আগের (সর্বশেষ ২০০৮ সালের) তথ্য-উপাত্তভিত্তিক। এমনও হতে পারে যে এসব ভিত্তি আসনের (মোট ২০টি আসন, যার মধ্যে বিএনপির ১৬টি) মানুষ যদি পদ্মা সেতুর সরাসরি উপকারভোগী হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে এসব ভিত্তি আসনের দলগত অবস্থা এখন সম্ভবত আগের মতো নেই।

ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলের "বিজয়-অনিশ্চিত" ১২২টি আসনে দোদুল্যমান ভোটাররা কোন দিকে যাবেন? এই ১২২টি আসনে মোট ভোটার আনুমানিক ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ (দেশের মোট ভোটারের প্রায় ৪১ শতাংশ), যাদের মধ্যে দোদুল্যমান ভোটারের সংখ্যা আনুমানিক ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৪০ হাজার। আসনপ্রতি গড়ে ভোটার প্রায় ৪ লক্ষ, আর দোদুল্যমান ভোটার ১ লক্ষ ২০ হাজার। প্রশ্ন হলো—দোদুল্যমান এসব ভোটারের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে কোন ফ্যাক্টর সম্ভাব্য কতটুকু ভূমিকা রাখবে? শেষপর্যন্ত দলভিত্তিক সম্ভাব্য চূড়ান্ত আসন বণ্টন কেমন হতে পারে?

ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলের ১২২টি "বিজয়-অনিশ্চিত" আসনে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে ৫টি অবজেক্টিভ ফ্যাক্টর কমবেশি ভূমিকা রাখবে: (১) দ্রব্যমূল্য, (২) মানব নিরাপত্তা, (৩) ২০১৮-এর নির্বাচন, (৪) স্যাংশন, (৫) পদ্মা সেতু। দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে প্রতিযোগী এসব ফ্যাক্টর যেভাবে কাজ করতে পারে, তার সম্ভাব্য গতিমুখ হবে—"দ্রব্যমূল্য", "২০১৮-এর নির্বাচন" এবং "মানব নিরাপত্তা"—বিএনপিমুখী, আর

"স্যাংশন এবং প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ ঘোষণাকেন্দ্রিক অবস্থান" মূলত আওয়ামী লীগমুখী। আবার দোদুল্যমান ভোটারদের ওপর এসব ফ্যাক্টরের প্রভাবের গতিমুখ সম্ভবত নিরঙ্কুশভাবে একক কোনো দলের পক্ষে কাজ করবে না। কারণ অনেক ফ্যাক্টরের কাউন্টার-ফ্যাক্টরও আছে, যা দোদুল্যমান ভোটারদের অনেকের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন "দ্রব্যমূল্য" ফ্যাক্টরের কাউন্টার-ফ্যাক্টর হলো সরকার পরিচালিত খোলাবাজারে স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য বিক্রি (আবার কোনো কারণে "দ্রব্যমূল্য" কমে এলে তার প্রভাব)। আবার "মানব নিরাপত্তা" ফ্যাক্টরেরও কাউন্টার-ফ্যাক্টর আছে, যেমন সরকার পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতাধীন বিভিন্ন ভাতা কর্মসূচি। এসব কাউন্টার-ফ্যাক্টর যেসব দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য, তাদের মধ্যে যারা দোদুল্যমান ভোটার—তাদের অনেকেই হয়তো বা ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে এসব বিবেচনা করবেন। কারণ এসব মানুষ হয়তো বা কোনো কিছুর বিনিময়ে এসব প্রত্যাশা বিসর্জন দিতে চাইবেন না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এসব মানুষ বাস্তবে যেসব সুবিধা পেয়েছেন ও পাচ্ছেন, তা অব্যাহত থাকুক—এটা তাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা হতে পারে দ্রব্যমূল্য ও মানব নিরাপত্তাকেন্দ্রিক বিষয়ে কাউন্টার-ফ্যাক্টর, যার সুবিধা যেতে পারে আওয়ামী লীগের পক্ষে। পদ্মা সেতুর ভোট-লভ্যাংশ-সুবিধা পাবে আওয়ামী লীগ, তবে দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলের দোদুল্যমান ভোটাররা যেহেতু সরাসরি উপকারভোগী নন, সেহেতু তাদের ক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টরের খুব বেশি গুরুত্ব থাকবে না। তবে ঢাকা-মাওয়া মধ্যবর্তী আসনগুলোতে "পদ্মা সেতুর ভোট লভ্যাংশ" কাজ করবে। সুবিধা যাবে আওয়ামী লীগের পক্ষে। "২০১৮ নির্বাচন" ফ্যাক্টরের সুবিধা পাবে বিএনপি। আর 'স্যাংশন' যদি জাতীয় ঐক্য-জাতীয় সংহতি সৃষ্টির কৌশল হয়, সেক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টরটির অনেক সুবিধা পেতে পারে আওয়ামী লীগ। তবে উল্লিখিত ফ্যাক্টর-কাউন্টার ফ্যাক্টরের প্রকৃত মান কী হবে তা আমাদের জানা নেই (সম্ভবত কেউই তা জানেন না)।

ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলের (অর্থাৎ পদ্মা সেতুর প্রভাব অঞ্চল নয়) ১২২টি "বিজয়-অনিশ্চিত" আসনে দোদুল্যমান ভোটারদের চূড়ান্ত ভোট প্রদান সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য গতিমুখ কেমন হতে পারে, তা নিরূপণে আমরা পাঁচটি অবজেক্টিভ ফ্যাক্টর-কাউন্টার ফ্যাক্টরসহ দেখার চেষ্টা করেছি। একই সাথে প্রভাবক হিসেবে কয়েকটি সাবজেক্টিভ ফ্যাক্টরের কথাও বলেছি, যার মধ্য আছে আত্মীয়তা, বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্টজন, মুরুব্বিদের উপদেশ-আদেশ-নির্দেশ, পিতৃতান্ত্রিকতা (নারীর ক্ষেত্রে)। এসবের মিথস্ক্রিয়া নির্ধারণ করবে দোদুল্যমান ভোটাররা কোন দিকে যাবেন এবং সম্ভাব্য আসন বণ্টন কেমন হবে? তবে সম্ভাব্য

আসন বণ্টন চিত্র যা-ই হোক না কেন, ওই ১২২টি আসনের সবগুলো বণ্টিত হবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে; কারণ অন্য সব দলের যা আসন, তার সবই ভিত্তি আসন (যে কারণে তারা বিজয়-অনিশ্চিত আসনের প্রতিযোগী নন)। সবকিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সাথে দীর্ঘ খোলামেলা আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলের দোদুল্যমান ভোট এবং ১২২টি "বিজয় অনিশ্চিত" আসনের আসন বিভাজন সম্ভাব্য তিন ধরনের প্যাটার্ন অনুসরণ করতে পারে।

প্যাটার্ন-১: দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট বিভাজন ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলে "ভিত্তি আসন" যেভাবে বণ্টিত, ঠিক সেই অনুপাত অনুসরণ করবে। (মনে রাখা দরকার যে "ভিত্তি আসন" হলো সেই আসন, যে আসনে বিজয়ীর দলীয় অনুগত ভোট কমপক্ষে ৪০ শতাংশ)। এ অঞ্চলের জন্য 'ভিত্তি আসন'-এর বণ্টন অনুপাতটি হলো ৪৫ শতাংশ আওয়ামী লীগ আর ৫৫ শতাংশ বিএনপি। অর্থাৎ প্যাটার্ন-১ যদি কাজ করে, সেক্ষেত্রে এ-অঞ্চলে "বিজয়-অনিশ্চিত" ১২২টি আসনের মধ্যে ৪৫ শতাংশ আসন পেতে পারে আওয়ামী লীগ আর ৫৫ শতাংশ আসন পেতে পারে বিএনপি। সেক্ষেত্রে প্যাটার্ন-১ অনুযায়ী এ অঞ্চলের ১২২টি বিজয় অনিশ্চিত আসনের চূড়ান্ত বণ্টন হতে পারে এ রকম: ৫৫টি আসন আওয়ামী লীগ, ৬৭টি আসন বিএনপি। অর্থাৎ বিএনপি আওয়ামী লীগের তুলনায় ১২টি আসন বেশি পাবে। **প্যাটার্ন-২:** দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট বিভাজন অনুসরণ করবে ঠিক সেই অনুপাত, যে অনুপাতে সারাদেশে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির "ভিত্তি ভোট" বিভাজিত। সারাদেশে আওয়ামী লীগের ভিত্তি ভোট ৩০ শতাংশ, বিএনপিরও ৩০ শতাংশ—অর্থাৎ সমান সমান। 'বিজয়-অনিশ্চিত' ১২২টি আসনও যদি ভিত্তি ভোট অনুপাতে সমান-সমান বণ্টিত হয়, সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ পাবে ৬১টি আসন বিএনপি পাবে ৬১টি আসন। **প্যাটার্ন-৩:** আওয়ামী লীগ যদি 'স্যাংশন'কেন্দ্রিক ইস্যুকে জাতীয় ঐক্য-জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার ভোট কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে এবং তুলনামূলক সফল হয়, আর একই সাথে অন্যান্য ফ্যাক্টরের কাউন্টার-ফ্যাক্টরগুলো তুলে ধরে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোটপ্রদান সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। এসব সম্ভাবনা অমূলক নয়। কারণ ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চল হলো ব্যবসায়ী অঞ্চল, আর পূর্বাঞ্চলের অনেক পরিবার মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রবাস আয় (রেমিট্যান্স) পেয়ে থাকে, দেশের শিল্পাঞ্চলগুলো পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত এবং ঢাকাসহ পূর্ব-পশ্চিম অঞ্চলে অনেক মেগা প্রজেক্ট চলমান—এসব অঞ্চলের মানুষ সঙ্গত কারণেই "স্যাংশন" বিষয়ে দুশ্চিন্তিত। আর তাই আওয়ামী লীগ যদি 'স্যাংশন'কে আসন্ন নির্বাচনে জাতীয় ঐক্য-জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে (যা হবে একই সাথে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, জাতীয়তাবাদী-জাতীয় মুক্তির স্বপক্ষে এবং ধর্মীয় ভাবানুভূতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; শেষোক্ত

ক্ষেত্রে ইরাক–ইরানের ওপর স্যাংশন থেকে শুরু করে লিবিয়া-আফগানিস্তান হয়ে প্যালেস্টাইন ইস্যুও সামনে আসবে), তা ভোটারদের মনে বেশ নাড়া দিতে পারে। এসবের ফল এমনও হওয়া অস্বাভাবিক নয়, যখন দোদুল্যমান ভোটারদের ৬০ শতাংশ তাদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে স্যাংশনসহ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচনা করবেন। তবে সবচে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর মানে একমাত্র ফ্যাক্টর নয়। আবার 'স্যাংশন' যদি কোনো কারণে কোনো ভোটারের মনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর বলে বিবেচিত হয়, সেক্ষেত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্যাংশন হতে পারে ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত ফ্যাক্টর। এসব বিবেচনা থেকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, ঢাকাসহ পূর্ব-পশ্চিম-উত্তরাঞ্চলের ১২২টি "বিজয়-অনিশ্চিত" আসনের মধ্যে ৬০ শতাংশ আসনের প্রতিটিতে কমপক্ষে ৫৬ শতাংশ দোদুল্যমান ভোটার তাদেরই ভোট দিলেন, যারা স্যাংশন ফ্যাক্টরকে জাতীয় ঐক্য-জাতীয় সংহতির ইস্যু হিসেবে উত্থাপন করলেন। এক্ষেত্রে "স্যাংশন" কৌশলের পুরো সুবিধাটা পাবে আওয়ামী লীগ। এসবই যদি ঠিক হয়, সেক্ষেত্রে প্যার্টন-৩ অনুযায়ী ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলের ১২২টি বিজয় অনিশ্চিত আসনের চূড়ান্ত আসন বণ্টন হতে পারে এ রকম: আওয়ামী লীগ ৭৩টি আসন আর বিএনপি ৪৯টি আসন।

আমাদের হিসাবে দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ১৫৫টি আসন হলো "ভিত্তি আসন" বা "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন" (যেসব আসনে কোন দল জিতবে তা মোটামুটি নিশ্চিত), আর ১৪৫টি আসন "ভিত্তি আসন নয়" তা "বিজয়-অনিশ্চিত আসন"। উভয় ক্ষেত্রেই আসন জয়ে ভূমিকা রাখবে দোদুল্যমান ভোটার। তবে ভিত্তি আসন অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে বিজয়-নিশ্চিত আসনে দোদুল্যমান ভোটারদের ভূমিকা থাকবে কম। "বিজয়-অনিশ্চিত" আসনের ভাগ্য নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা থাকবে দোদুল্যমান ভোটারদের। বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তভিত্তিক হিসেবপত্তর করে আমরা দেখছি যে দেশের ১৪৫টি "বিজয়-অনিশ্চিত" আসনের মধ্যে শেষপর্যন্ত আওয়ামী লীগ পেতে পারে ৭৮-৯৬টি আসন; আর বিএনপি পেতে পারে ৪৯-৬৭টি আসন (সারণি ৫)। দেশের দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে যে ২৩টি বিজয়-অনিশ্চিত আসন আছে, তার সবকটি পাবে আওয়ামী লীগ, আর এসবে একমাত্র ভূমিকা রাখবে পদ্মা সেতু—এসব হলো পদ্মা সেতু ভোট লভ্যাংশ (Padma Bridge Vote Dividend)। এর ব্যত্যয় হওয়ার খুব একটা কারণ নেই। আর ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলে যে ১২২টি বিজয়-অনিশ্চিত আসন আছে, তার মধ্যে আওয়ামী লীগ পেতে পারে ৫৫-৭৩টি আসন, আর বিএনপি ৪৯-৬৭টি আসন (সারণি ৫)।

সারণি ৫: "বিজয়-অনিশ্চিত আসন" (ভিত্তি আসনবহির্ভূত আসন)-এর দলভিত্তিক সম্ভাব্য চূড়ান্ত আসন বণ্টন (মোট ১৪৫টি আসন)

বিজয়-অনিশ্চিত আসন		আওয়ামী লীগ	বিএনপি	মোট
অঞ্চল/প্যাটার্ন	সংখ্যা			
দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল (পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক অঞ্চল-পদ্মা সেতু ভোট লভ্যাংশ অঞ্চল)	২৩	২৩		২৩
পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চল (ঢাকাসহ)	১২২	৫৫-৭৩	৪৯-৬৭	১২২
-প্যাটার্ন ১: ভিত্তি আসন অনুপাতে বিভাজন		৫৫	৬৭	১২২
-প্যাটার্ন ২: ভিত্তি ভোট অনুপাতে বিভাজন		৬১	৬১	১২২
-প্যাটার্ন ৩: স্যাংশনকেন্দ্রিক জাতীয় ঐক্য-সংহতি কৌশল প্রয়োগে		৭৩	৪৯	১২২
মোট		৭৮-৯৬	৪৯-৬৭	১৪৫

কেমন হতে পারে আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য চূড়ান্ত ফলাফল? কোন দলের সরকার গঠন সম্ভাবনা কতটুকু?

ভোটারের সম্ভাব্য দলীয় আনুগত্য অবস্থা, "ভিত্তি ভোট" (দলীয় অনুগত ভোটারের ভোট)-এর ধারণা, "ভিত্তি আসন" ("সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন")-এর ধারণা, "বিজয়-অনিশ্চিত আসন"-এর ধারণা, দোদুল্যমান ভোট, দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনের ফ্যাক্টর-কাউন্টার ফ্যাক্টর এবং এসবের সম্ভাব্য প্রভাব ও গতিমুখ, ভোটারদের ভৌগলিক অবস্থান বিভাজন (পদ্মা সেতুর প্রভাব অঞ্চল এবং তার বাইরের অঞ্চল)—এসব কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আমরা আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য চূড়ান্ত আসন বণ্টন ফলাফল নিরূপণের চেষ্টা করেছি।

আমাদের হিসাবে আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য চূড়ান্ত ফলাফল হতে পারে এ রকম: ৩০০ আসনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেতে পারে ১৪৮-১৬৬টি আসন, বিএনপি পেতে পারে ১১৯-১৩৭টি আসন, আর অন্যান্য দল পেতে পারে ১৫টি আসন (জাতীয় পার্টি ১১টি আসন, জামায়াতে ইসলামী ২টি আসন, এনডিপি ১টি আসন, বিজেপি ১টি আসন) (সারণি ৬ ও ছক ৩)।

ছক ৩: আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলভিত্তিক সম্ভাব্য আসনসংখ্যা
(মোট আসন সংখ্যা ৩০০)

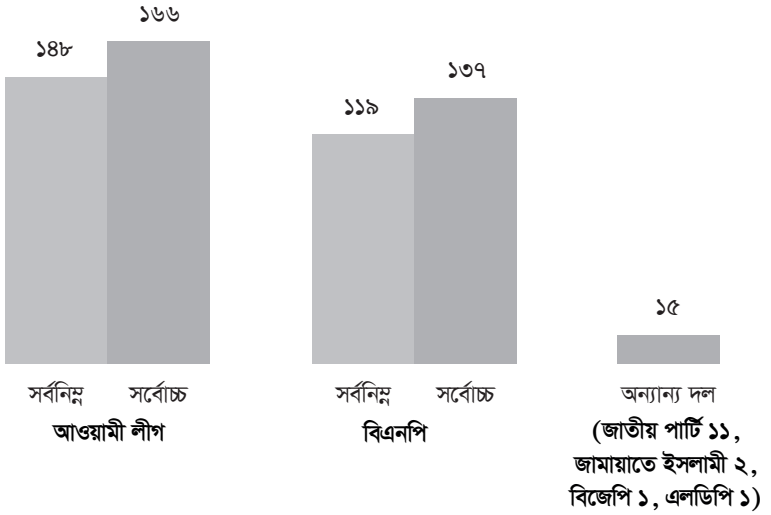

আওয়ামী লীগ যে ১৪৮-১৬৬টি আসন পেতে পারে তার মধ্যে ৭০টি "ভিত্তি আসন" (দেশে মোট ভিত্তি আসন সংখ্যা ১৫৫টি), বাদবাকি ৭৮-৯৬টি আসন "বিজয়-অনিশ্চিত আসন"-এর অংশ (দেশে এ ধরনের মোট আসনসংখ্যা ১৪৫টি)। আওয়ামী লীগের প্রাপ্তি-সম্ভাব্য ১৪৮-১৬৬টি আসনের মধ্যে ৪৮টি আসন আসবে দেশের দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল থেকে (এ অঞ্চলে মোট আসনসংখ্যা ৬৮টি), আর ১০০-১১৮ আসন আসবে ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চল থেকে (এ অঞ্চলে মোট আসনসংখ্যা ২৩২টি) (সারণি ৬)।

বিএনপি যে ১১৯-১৩৭টি আসন পেতে পারে, তার মধ্যে ৭০টি "ভিত্তি আসন", আর বাদবাকি ৪৯-৬৭টি আসন "বিজয়-অনিশ্চিত আসন"-এর অংশ। বিএনপির প্রাপ্তি-সম্ভাব্য ১১৯-১৩৭টি আসনের মধ্যে ১৬টি আসন আসবে দেশের দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল থেকে, আর ১০৩-১২১টি আসন আসবে ঢাকাসহ দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চল থেকে (সারণি ৬)।

সারণি ৬: আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলভিত্তিক সম্ভাব্য আসন বিন্যাস

আসন: ধরন ও ভৌগলিক অঞ্চল	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	অন্যান্য দল	মোট
আসন (সংখ্যা) মোট ৩০০ আসনের মধ্যে	১৪৮-১৬৬	১১৯-১৩৭	১৫	৩০০
তন্মধ্যে, "ভিত্তি আসন" ("সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন")	৭০	৭০	১৫	১৫৫
"বিজয়-অনিশ্চিত আসন" (শেষপর্যন্ত ফলাফল)	৭৮-৯৬	৪৯-৬৭	-	১৪৫
"দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল- (পদ্মা সেতুর প্রত্যক্ষ প্রভাবাঞ্চল) (২৩টি পদ্মা সেতুর লভ্যাংশ আসন)	৪৮	১৬	৪	৬৮
ঢাকাসহ পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চল (যেসব অঞ্চলে পদ্মা সেতুর প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই)	১০০-১১৮	১০৩-১২১	১১	২৩২

সম্ভাব্য চূড়ান্ত ফলাফল বহাল থাকলে আওয়ামী লীগের পক্ষে জোটবদ্ধভাবে সরকার গঠন সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে জোট হতে হবে জাতীয় পার্টির সাথে। তবে আওয়ামী লীগের পক্ষে এককভাবে সরকার গঠন সম্ভব হতে পারে, যদি তাদের আসনসংখ্যার গতিমুখ সর্বোচ্চ সম্ভাব্য-আসনমুখী হয় (অর্থাৎ সর্বনিম্ন ১৪৮ আসন থেকে সর্বোচ্চ ১৬৬ আসনমুখী হয়)।

সম্ভাব্য চূড়ান্ত ফলাফল যদি বহাল থাকে, তাহলে বিএনপির পক্ষে এককভাবে সরকার গঠন সম্ভাবনা নেই। তবে বিএনপির পক্ষে জোটবদ্ধ সরকার গঠনের পাটিগাণিতিক সম্ভাবনা যতটুকু আছে, তা যথেষ্ট শর্তসাপেক্ষ। এক্ষেত্রে বিএনপিকে অবশ্যই সম্ভাব্য সর্বোচ্চসংখ্যক আসন প্রাপ্তি (১৩৭টি আসন) নিশ্চিত করে জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সবার সাথে জোটবদ্ধ হতে হবে এবং একই সাথে আওয়ামী লীগের আসনসংখ্যা কোনো অবস্থাতেই সম্ভাব্য সর্বনিম্নসংখ্যক (১৪৮টি আসন) আসনের বেশি হতে পারবে না। এত বেশি শর্তসাপেক্ষ বিধায়, বিএনপির পক্ষে জোটবদ্ধ সরকার গঠনের বাস্তব সম্ভাবনা ক্ষীণ।

আসন্ন সংসদ নির্বাচনের দলভিত্তিক সম্ভাব্য চূড়ান্ত ফলাফল নিয়ে আমাদের এসব হিসাব বাস্তবে ভিন্নতরও হতে পারে—হিসাবে যা দেখানো হলো, তার তুলনায় কম বা বেশি যেকোনোটাই হতে পারে। দলভিত্তিক মোট আসনসংখ্যা কমবেশি হওয়া যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে তা হলো: (১) ভিত্তি ভোটের হিসেবপত্তর ভিন্ন হলে (অর্থাৎ দলীয় অনুগত ভোট মোট ভোটের ৩০ শতাংশ—আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়েরই), (২) ভিত্তি আসনের সংখ্যা ভিন্ন হলে (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়েরই ৭০টি করে আসন), (৩) "দোদুল্যমান ভোট" অর্থাৎ যারা "দলীয় অনুগত ভোটার নন" অথবা যারা "এখনও ভোট প্রদান সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেননি" তাদের হিসেবপত্তর (৩০ শতাংশ ভোটার), (৪) "দোদুল্যমান ভোটার"রা যে ৫টি বিষয় বিবেচনা করবেন বলে ধরা হয়েছে—"দ্রব্যমূল্য", "মানব নিরাপত্তা", "পদ্মা সেতু", "২০১৮ নির্বাচন" এবং "স্যাংশন"—এসবের ব্যাখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট ফ্যাক্টর ও কাউন্টার-ফ্যাক্টরের প্রভাবের মান-মাত্রা-অভিমুখ এবং/অথবা অন্য কোনো ফ্যাক্টর যা বাস্তবে গুরুত্বপূর্ণ অথচ বিবেচনা করা হয়নি।

আমরা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলভিত্তিক সম্ভাব্য আসনসংখ্যার যে প্রক্ষেপণ করলাম, তার সঠিকতা-মাত্রা নিয়ে ভোট গবেষক, রাজনীতিবিদ, সর্বসাধারণ মানুষ—যে-কেউই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। এসবই আমরা জানি। জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল তো বটেই বাস্তব ফলাফলও বেশ স্পর্শকাতর বিষয়। জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে মতভিন্নতা খুবই স্বাভাবিক। এসব বিবেচনাবোধ থেকেই আমরা বিভিন্ন ভিত্তি-অনুসিদ্ধান্ত যুক্তিমত পরিবর্তন করে নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফলে কী ধরনের পরিবর্তন হয়, তা দেখার চেষ্টা করেছি। এ জন্য ভিত্তি ভোট, ভিত্তি আসন এবং দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট—এসব চলকের মান পরিবর্তন করে বিজ্ঞানসম্মত সেনসিটিভিটি অ্যানালাইসিস ও ফ্যাক্টর অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস করে দেখেছি যে তাতে দলভিত্তিক আসনসংখ্যার যতটুকু পরিবর্তন হয়, তা আমাদের চূড়ান্ত উপসংহারে তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না (এ সম্পর্কে বিস্তারিত নিচে বক্স-২-এ দেখুন)।

বক্স ২: প্রক্ষেপিত নির্বাচনী ফলাফলের সঠিকতা প্রসঙ্গে

আমরা বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তভিত্তিক হিসেবপত্তর দিয়ে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য যে ফলাফলে উপনীত হয়েছি, তা হলো—৩০০ আসনের সংসদে আওয়ামী লীগ পেতে পারে ১৪৮-১৬৬টি আসন, বিএনপি পেতে পারে ১১৯-১৩৭টি আসন; আর অন্যান্য দল পেতে পারে ১৫টি আসন। আমাদের প্রক্ষেপিত হিসাব কত দূর সঠিক-বেঠিক তা বুঝতে আমরা কিছু প্রয়োজনীয় অ্যানালাইসিস করেছি, যার মধ্যে আছে সেনসিটিভিটি অ্যানালাইসিস এবং ফ্যাক্টর অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস। আমাদের হিসেবপত্তরের ভিত্তি হিসাবে বড় মাপের তিনটি চলক (variable) কাজ করছে: (১) ভিত্তি ভোট, (২) ভিত্তি আসন, (৩) দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য কাঠামো (অনুপাত)। আমরা ৩টি চলকের সম্ভাব্য মান যৌক্তিকভাবে পরিবর্তন করে দেখেছি যে, তাতে দলভিত্তিক আসন বণ্টনে এমন কোনো হেরফের হয় না—যাতে করে চূড়ান্ত উপসংহার পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলের ক্ষেত্রে একই সাথে ভিত্তি ভোট (দলীয় অনুগত ভোট) ৫ শতাংশ এদিক-ওদিক করে দেখেছি (যার প্রভাব পরে দোদুল্যমান ভোটের ওপর) যে, তাতে শেষপর্যন্ত প্রক্ষেপিত দলভিত্তিক আসন সংখ্যা তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। "ভিত্তি আসন"-এর সংজ্ঞা আরো রক্ষণশীল এবং আরো উদার করেও দেখেছি যে তাতে "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন" ও "বিজয়-অনিশ্চিত আসন" সংখ্যার হেরফের হলেও প্রক্ষেপিত নির্বাচনী ফলাফল কাঠামোতে তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। সর্বশেষে দোদুল্যমান ভোটারসংশ্লিষ্ট যেসব অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সেসবও কিছুটা পরিবর্তন করে সম্ভাব্য নির্বাচনী ফলাফল অ্যাডজাস্ট করে দেখেছি যে, তাতেও চূড়ান্ত ফলাফলে তেমন কোনো প্রভাব পড়ে না—চূড়ান্ত উপসংহার কাঠামো মোটামুটি অপরিবর্তিতই থাকে। সুতরাং, আমরা আসন্ন ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের সম্ভাব্য আসনসংখ্যার যে প্রক্ষেপণ করেছি, তা যথেষ্টমাত্রায় সঠিক ও দৃঢ়-সবল (correct and robust) বলে বিবেচিত হতে পারে। এসব এও প্রমাণ করে—সম্ভাব্য নির্বাচনী ফলাফলসংশ্লিষ্ট আমাদের গৃহীত পদ্ধতিতত্ত্ব (methodology) যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত।

উপসংহার

১। আসন্ন ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার প্রায় ১২ কোটি (নির্বাচন কমিশন সূত্রমতে ১১ কোটি ৯০ লক্ষ)। এসব ভোটারের ৭০ শতাংশই দলীয় অনুগত ভোটার—এসব ভোটার তাদের অনুগত দলে ভোট দেবেন। এসব ভোট হলো দলের জন্য "ভিত্তি ভোট"। মোট ভোটে দলীয় অনুগত ভোটের ("ভিত্তি ভোট") অনুপাত: ৩০ শতাংশ আওয়ামী লীগ, ৩০ শতাংশ বিএনপি, ১০ শতাংশ অন্যান্য দল। দলীয় অনুগত "ভিত্তি ভোট" (base

vote)-এর বাইরে বাকি ৩০ শতাংশ "দলীয় অনুগত নন"—এসবই হলো "দোদুল্যমান ভোট"—এরা কাকে ভোট দেবেন, তা পূর্বনির্ধারিত নয়।

২। দেশের ৩০০টি সংসদ আসনের মধ্যে ১৫৫টি আসনের ভাগ্য মোটামুটি নির্ধারিত বলা চলে। এসবই হলো "ভিত্তি আসন" (base seat) বা "সম্ভাব্য বিজয়-নিশ্চিত আসন"। এসব ১৫৫টি আসনের মধ্যে ৭০টি আসন পাবে আওয়ামী লীগ, ৭০টি আসন পাবে বিএনপি, আর বাকি ১৫টি আসন পাবে অন্যান্য দল (জাতীয় পার্টি ১১টি, জামায়াতে ইসলামী ২টি, এলডিপি ১টি, বিজেপি ১টি)।

৩। "ভিত্তি ভোট" এবং "ভিত্তি আসন" দিয়ে সরকার গঠন-উদ্দিষ্ট ভোট/আসন নিরূপিত হবে না।

৪। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি—উভয়েরই ৭০টি করে "ভিত্তি আসন" আছে। দুটি দলের মধ্যে যেকোনো দলের জন্য সরকার গঠন-উদ্দিষ্ট আরও যে ৮১টি আসন (এসবই "বিজয়-অনিশ্চিত আসন") প্রয়োজন, তা পেতে হলে দুই বড় দলকে নির্ভর করতে হবে "দোদুল্যমান ভোটারদের" ভোটের ওপর। যেকোনো আসনে জিততে হলে দোদুল্যমান ভোটারদের ৫৬ শতাংশ ভোট পেতে হবে। আর এসব নির্ধারিত হবে ১৪৫টি আসনের প্রতিটিতে (সবগুলোই "বিজয়-অনিশ্চিত আসন")।

৫। এবারে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তে ৫টি অবজেক্টিভ ফ্যাক্টর ও সংশ্লিষ্ট কাউন্টার-ফ্যাক্টর কাজ করবে বলে মনে হয়। তা হলো: দ্রব্যমূল্য, মানব নিরাপত্তা, পদ্মা সেতু, ২০১৮ সালের নির্বাচন, এবং স্যাংশন। 'পদ্মা সেতু' ও 'স্যাংশন' ফ্যাক্টর ২টি আওয়ামী লীগ ভোট কৌশলে কাজে লাগাবে, বিএনপি কাজে লাগাবে অন্য ৩টি ফ্যাক্টর—দ্রব্যমূল্য, ২০১৮ সালের নির্বাচন ও মানব নিরাপত্তা। একই সাথে প্রভাবক হিসেবে কয়েকটি সাবজেক্টিভ ফ্যাক্টরও কাজ করবে যেমন— আত্মীয়তা, বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্টজন, মুরুব্বিদের উপদেশ-আদেশ-নির্দেশ, পিতৃতান্ত্রিকতা (নারীর ক্ষেত্রে)।

৬। দেশের দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের মোট ৬৮টি আসনের মধ্যে ২৩টি "বিজয়-অনিশ্চিত আসন"। এসব আসনে "পদ্মা সেতু ফ্যাক্টর" ("পদ্মা সেতু ভোট লভ্যাংশ") কাজে লাগিয়ে আওয়ামী লীগ দোদুল্যমান ভোটারদের ৬০ শতাংশ রায় পেতে পারে। ফলে এই অঞ্চলে আওয়ামী লীগের কমপক্ষে

২৫টি ভিত্তি আসনের সাথে আরো ২৩টি আসন যোগ হয়ে তাদের মোট আসনসংখ্যা দাঁড়াতে পারে কমপক্ষে ৪৮টি।

৭। দেশের দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের বাইরে—ঢাকাসহ পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলে যে ২৩২টি আসন আছে, তার মধ্যে ১২২টি আসনে—"বিজয়-অনিশ্চিত আসন"—জয়-পরাজয়ে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে (বাদবাকি ১১০টি আসন মোটামুটি "ভিত্তি আসন")। এসব আসনে দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট পেতে পারে আওয়ামী লীগ ৪৫-৬০ শতাংশ আর বিএনপি ৪০-৫৫ শতাংশ। এই ১২২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ জয়ী হতে পারে ৫৫-৭৩টি আসনে আর বিএনপি জয়ী হতে পারে ৪৯-৬৭টি আসনে।

৮। **৩০০ আসনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেতে পারে ১৪৮-১৬৬টি আসন, বিএনপি ১১৯-১৩৭টি আসন, অন্যান্য দল ১৫টি আসন (জাতীয় পার্টি ১১টি, জামায়াতে ইসলামী ২টি, এলডিপি ১টি, বিজেপি ১টি)।**

৯। নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল বিন্যাস যা তাতে আওয়ামী লীগের পক্ষে সরকার গঠন সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি—তা জোটবদ্ধ তো বটেই এককভাবেও হতে পারে (শেষোক্ত ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের মোট আসনসংখ্যা হতে হবে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আসনমুখী অর্থাৎ ১৬৬ আসনমুখী)। আওয়ামী লীগকে জোটবদ্ধ সরকার গঠন করতে হলে জাতীয় পার্টির সাথে জোট করতে হবে। বিএনপির পক্ষে সরকার গঠন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বিএনপির পক্ষে জোটবদ্ধ সরকার গঠনের একটি পাটিগাণিতিক সম্ভাবনা আছে—যে সম্ভাবনা অনেক বেশি শর্তসাপেক্ষ বিধায় দুর্বল। শর্তসমূহ হলো (১) বিএনপিকে পেতে হবে সম্ভাব্য সর্বোচ্চসংখ্যাক আসন (১৩৭টি আসন), (২) জোট করতে হবে জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, বিজেপি এবং এলডিপির সাথে, (৩) আওয়ামী লীগকে তার সম্ভাব্য সর্বনিম্নসংখ্যাক আসনের (১৪৮ আসন) বেশি পাওয়া চলবে না।

১০। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল—দলভিত্তিক যা দেখানো হলো, বাস্তবে তার চেয়ে কমবেশি হতে পারে। কমবেশি হওয়া যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে, তা হলো—ভিত্তি ভোট, ভিত্তি আসন এবং দোদুল্যমান ভোটারদের ভোট প্রদান সিদ্ধান্তের প্যাটার্ন। তবে আসনসংখ্যার সম্ভাব্য ফলাফলজনিত পরিবর্তন যা-ই হোক না কেন, তাতে আমাদের প্রক্ষেপিত দলভিত্তিক আসন বণ্টন কাঠামো এবং চূড়ান্ত উপসংহার অপরিবর্তিতই থাকবে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
কার্যনির্বাহক কমিটি ২০২২-২০২৩

সভাপতি	:	অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক হান্নানা বেগম অধ্যাপক ড. মোঃ আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার অধ্যাপক ড. মোঃ সাইদুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ	:	এ জেড এম সালেহ্
যুগ্ম-সম্পাদক	:	বদরুল মুনির শেখ আলী আহমেদ টুটুল
সহ-সম্পাদক	:	পার্থ সারথী ঘোষ মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সৈয়দ এসরারুল হক সোপেন মোঃ হাবিবুল ইসলাম
সদস্য	:	ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল ড. জামালউদ্দিন আহমেদ *এফসিএ* অধ্যাপক ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী অধ্যাপক শাহানারা বেগম অধ্যাপক ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন অধ্যাপক ড. মোঃ শামিমুল ইসলাম মোঃ মোজাম্মেল হক ড. শাহেদ আহমেদ মেহেরুননেছা খোরশেদুল আলম কাদেরী নেছার আহমেদ মোহাম্মদ আকবর কবীর অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামান খান

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা
ফোন: ৮৮০-০২-২২২২৫৯৯৬
E-mail: bea.dhaka@gmail.com, Web: www.bea-bd.org

আবুল বারকাত, পিএইচডি, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ; অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থ, প্রবন্ধ, মনোগ্রাফ, অভিসন্দর্ভ, লোকবক্তৃতা—সব মিলিয়ে প্রকাশিত লেখার সংখ্যা প্রায় আটশত। প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা অর্ধশত। তাঁর ধ্রুপদী গবেষণাগ্রন্থ, "বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে" (২০২০) অতি অল্পসময়েই সারস্বত সমাজে-চিন্তাজগতে আলোড়ন তুলেছে। অর্থনীতি শাস্ত্র, সামাজিক বিজ্ঞান ও শিক্ষা-গবেষণায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে জাপান সরকারের রাষ্ট্রীয় পদক 'অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান, গোল্ড রেস উইথ নেক রিবন', 'ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক এসোসিয়েশন ফেলো অ্যাওয়ার্ড', 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্বর্ণপদক' ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ গবেষণা পদক 'বিচারপতি ইব্রাহিম স্মৃতি স্বর্ণপদক' অন্যতম। 'গণমানুষের অর্থনীতিবিদ' আবুল বারকাত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির চারবারের নির্বাচিত সভাপতি।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
ফোন: ৮৮ ০২ ২২২২২৫৯৯৬
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
ওয়েব: www.bea-bd.org